ভারতের পণ্য

তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার

প্রথম খণ্ড

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কিউরেটর, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম, কলিকাতা কর্পোরেশন

মূল্য এক টাকা চারি আনা

ভূমিকা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার ফলে বাঙ্গালী শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই আন্দোলন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেও তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কি কারণে জানি না তখনও ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙ্গালীকে ভাল করিয়া টানিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্যায় বাঙ্গালীকে আরও বহু দূর ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পর ১৮ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এখন আর বাঙ্গালীকে ব্যবসাবিমুখ বলিয়া দোষ দেওয়া চলে না। সফলকাম হউক বা না হউক, বাহিরের বাধাবিঘ্ন তাহাকে যতই নিরুৎসাহ করুক না কেন, আজ বাঙ্গালী ব্যবসায়ের সকল ক্ষেত্রেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে উৎসুক হইয়া থাকে এবং তাহার ফলেই আজ বাঙ্গালী পরিচালিত বহু কারবার অন্যান্য দেশের কারবারগুলির সমকক্ষ হইয়া তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমরা যে এখনও বহু পিছনে পড়িয়া আছি, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা স্কুল কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থনীতি শিক্ষা করি, তাহা কখনও কাজে লাগাইবার চেষ্টা করি না। আমাদের দেশের বড় বড় অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থনীতির মূলসূত্র লইয়া বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু বাস্তব জগতের সহিত সেই সকল গ্রন্থের সম্বন্ধ অতিশয় কম। আবার যে দুই একখানি গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা-ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত। দেশের সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের সহিত ইংরেজির সম্বন্ধ নাই

বলিলেই হয়। এখনও এদেশে শিক্ষার প্রসার এত অল্প যে,—যে ২।৪ জন লোকে উচ্চ শিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারা অন্য কাজে নিযুক্ত হইয়া যান—চির-উপেক্ষিত ব্যবসাক্ষেত্রের দিকে তাঁহারা প্রায়ই অগ্রসর হন না। যাহারা পুরুষানুক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য করিত বা যাহারা অন্য কোন অল্প শ্রমসাধ্য কার্য না পায়, তাহারাই শুধু ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। সেইজন্যই ব্যবসা ও শিল্প সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় সহজ ও সরল করিয়া লিখিত পুস্তকের প্রয়োজন এদেশে খুবই বেশী।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের কিউরেটর শ্রীমান কালীচরণ ঘোষ বহুদিন হইতে শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালী যুবকগণকে নূতন নূতন ব্যবসা-ক্ষেত্রে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। এতদিন তাঁহার প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রসমূহের পৃষ্ঠাই অলঙ্কৃত করিত, সম্প্রতি তিনি এ বিষয়ে যে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত প্রথম পুস্তকই বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলার সর্বসাধারণের (শুধু ব্যবসায়ী ও ব্যবসা করিতে উৎসুক ব্যক্তিগণের নহে) পাঠোপযোগী করিয়া এত কঠিন বিষয় যে লেখা যায়, শ্রীমান কালীচরণের পুস্তক পাঠ করিবার পূর্বে, তাহা আমাদের ধারণারই অতীত ছিল। তাঁহাকে এত আধুনিক হিসাব সংগ্রহ করিতে এবং সেই হিসাবগুলি সহজবোধ্য করিয়া সাজাইয়া দিতে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা এবিষয়ে আলোচনা করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তিনি যে ভাবে ভারতজাত সকল পণ্যের কথা আমাদিগকে জানাইবেন বলিয়া চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে

হয়, ইহা পাঠ করিয়া বহু উৎসাহী যুবক শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে এবং যে সকল বাণিজ্যের কথা আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, দেশে সেই সকল বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

আমরা ব্যবসায়ী নহি, তবে সারাজীবন অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকার ফলে, কোন্ পুস্তক ছাত্রগণ পড়ে, আর কোন পুস্তক পড়ে না, সে বিষয়ে আমাদের একটি সুদৃঢ় ধারণা হইয়াছে। সেইজন্য আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এই ধরণের পুস্তক ছাত্রগণের মধ্যে সুপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং হয়ত অচিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এরূপ পুস্তক পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

শ্রীমান কালীচরণ ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াও যে বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ দুরূহ গ্রন্থ রচনায় মনোযোগী হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছে। আশীর্বাদ করি, তাঁহার এই চেষ্টা সফল হউক এবং তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া বাঙ্গালী যুবকগণ তাঁহার প্রদর্শিত পথে ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক।

প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা
৩।১১।৩৮

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

নিবেদন

অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা ছিল যে ভারতের পণ্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখি। বহু কোটী টাকার পণ্য রপ্তানী হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ নাই বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে বৈদেশিক পণ্ডিতে এ বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ বিদেশী ভাষায় লিখিত এবং ভারতের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখা নয় বলিয়া অনেক সময় তাহা একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট। ভারতের পণ্য সম্বন্ধে সকল আধুনিক তথ্য সম্বলিত দেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক আর নাই বলিয়া আমার মনে হয়। এক একটী পণ্য কত পরিমাণের এবং কত মূল্যের প্রতি বৎসর কোথায় যায় এবং কোন্ প্রদেশ তাহা রপ্তানী করে হয়ত পণ্য সম্বন্ধে এই জ্ঞানই একখানি পুস্তকের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সেই সকল বস্তু কোথায় অধিক জন্মায়, পৃথিবীতে আর কেহ উৎপন্ন করে কি না, শস্যাদি ক্রয় বিক্রয়ে হ্রাসবৃদ্ধি কেন হয়, ঐ সকল পণ্য আমরা আমদানী করি কি না, করিলে, তাহার কারণ কি এবং ঐ পদার্থ বিদেশে কেন যায় অর্থাৎ তাহা হইতে আধুনিক উপায়ে কি বস্তু প্রস্তুত হইয়া জগতের নিকট সমাদর লাভ করিতেছে ইত্যাদি সকল বিষয় কোনও পুস্তকে বিশেষ কিছুই নাই। এ সকল সঙ্কলন করিয়া একস্থানে গ্রথিত করা এক বিরাট সমস্যা এবং সেই কারণেই তাহা অসম্পূর্ণ থাকাই সম্ভব। কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও

পরবর্ত্তী লেখকগণ এই সকল বিষয়ে কিছু আভাষ পাইতে পারেন মনে করিয়া যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া সেই সকল বিষয় সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ভারতের পণ্য নানা অংশে বিভক্ত সুতরাং পুস্তকেরও যে নানা অংশ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ইচ্ছা আছে পরবর্ত্তী খণ্ডে, তন্তু—উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজাত; আবাদী পণ্য বা ফসল, যথা,—চা, কফি, ইক্ষু, তামাক, নীল প্রভৃতি; নানারূপ মশলা, যথা,—সুপারি, লঙ্কা, মরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি; নানারূপ মূল, যথা, আদা, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি; বনস্পতিজাত দ্রব্য,—যথা কাষ্ঠ, রবার, হরীতকী, ত্বক্, রস বা আঠা, কাজু বাদাম ও অন্যান্য ফল; খনিজাত দ্রব্য, বিশেষতঃ কয়লা, লৌহ, তাম্র, সীসা, ম্যানগানিস্, অভ্র ইত্যাদি এবং পশ্বাদি হইতে প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য, যথা—লাক্ষা, অস্থি, চর্ম্ম, শৃঙ্গ, লোম প্রভৃতি সকল বিষয় আলোচনা করিব।

কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য সংগ্রহ করা যে কি সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। প্রথমে যখন এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা হয়, তখন পরমসুহৃদ শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাই। তিনি আমাকে আন্তরিক উৎসাহ দেন এবং "ভারতবর্ষে" প্রথম প্রবন্ধ ছাপাইবার পর আমাকে পুনরায় প্রবন্ধ লিখিবার অনুরোধ জানান। আমাকে এই ভাবে সাহায্য করিবার জন্য আমি "ভারতবর্ষে"র কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট কৃতজ্ঞ, বিশেষ করিয়া "ফণীদা" আমার ধন্যবাদার্হ। পরে কোনও কোনও প্রবন্ধ "সংহতি" ও "দেশ" পত্রিকায় বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু আসল কথা, মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠায় যে ভাবে প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল, পুস্তকের

আকারে তাহা বিসদৃশ ঠেকিল। সুতরাং সমস্ত প্রবন্ধ আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিতে হইল; ইত্যবসরে অঙ্কগুলিও যতদূর পারিয়াছি, একেবারে "হাতনাগাদ" করিয়া দিয়াছি।

অঙ্ক সম্বন্ধে একটী কথা বলা প্রয়োজন। প্রতি বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেখানে সরকারী অঙ্ক পাইয়াছি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আন্তর্জ্জাতিক মহাসভা (League of Nations)র পুস্তকাদির সাহায্য লইয়াছি। এতদ্ব্যতিরেকে যতদূর পারিয়াছি ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রের যত দেশী ও বিদেশী সাময়িক পত্রিকাদি পাইয়াছি, তাহা হইতেও সংগ্রহ করিয়াছি। এ সকল অঙ্ক অনেক সময় আনুমানিক; শতকরা পাঁচভাগ পর্য্যন্ত একের অঙ্ক হইতে অপরের অঙ্কের পার্থক্য আছে। তাহা সত্ত্বেও ইহাই বর্ত্তমানের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং এই সকল অঙ্কের উপর নির্ভর করা ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য উপায় নাই। যে সকল পুস্তকাদির সাহায্য লইতে হইয়াছে, তন্মধ্যে Watt কৃত "Commercial Products of India" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পুস্তকখানি যখন সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা হইবে, তখন এক একটী পণ্যের সহিত ভারতবর্ষে যে সকল শিল্প সংশ্লিষ্ট আছে, তাহার উত্থান পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিবার বাসনা রহিল। এই সম্পর্কে কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছে। শর্করা প্রভৃতি সকল বৃহদাকার শিল্পের অবস্থা পুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা আছে।

পরিশেষে বক্তব্য, যাঁহারা আমায় উৎসাহ দিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এ বিষয়ে আমার শিক্ষাগুরু, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা

আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি কমার্শিয়াল মিউজিয়মের কার্য্যে আমায় নিযুক্ত না করিলে, বইখানি এই সকল তথ্য সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিদ্যার প্রবীন অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের "পরিভাষা সমিতির" সম্পাদক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, মহাশয়ের স্নেহলাভ করিয়া আজীবন নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি। আজ তিনি আমার এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকের জন্য শ্রম স্বীকার করিয়া ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিলেন; তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইতেছি।

শরীর অসুস্থ, তাহার উপর নানাকার্য্যের মধ্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সমস্ত প্রুফ আমায় সংশোধন করিতে হইয়াছে এবং সে কারণে কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দীর্ঘ ভূমিকা শেষ করিলাম। ইতি—

৬বি, রাজা বসন্ত রায় রোড
কালীঘাট,
৺শারদীয়া সপ্তমী ১৩৪৫।

গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

১

তণ্ডুল ও দ্বিদল

তণ্ডুল ও দ্বিদল বা ডাল কলাই ভারতের পণ্যের বাজারে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাৎসরিক রপ্তানীর পরিমাণ সাড়ে নয় কোটী টাকা এবং ব্রহ্ম হইতে চাউলের মূল্য ধরিয়া আমদানী বারো কোটী টাকার উপর। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার তণ্ডুলের বাণিজ্য ভারতের চাষী ও জনসাধারণের স্বার্থের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই সংশ্লিষ্ট।

রপ্তানীর পরিমাণ সম্বন্ধে কোনই স্থিরতা না থাকায়, চাষীকে মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করিতে হয়। তণ্ডুলের রপ্তানীর মধ্যে চাউল ও গমের পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু কবে যে ইহার রপ্তানী হ্রাস বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। তিন বৎসর পূর্ব্বে গমের রপ্তানী ছিল সাড়ে নয় লক্ষ টাকা; কিন্তু পর বৎসর দুই কোটী টাকার উপরে চলিয়া যায়, এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা সাড়ে চার কোটী টাকার উপরে পৌছিয়াছে। গমের সহিত আটা ময়দার রপ্তানীরও তারতম্য লক্ষিত হয়।

আজ যাহা পণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কাল হয়ত তাহার হিসাব কেহ রাখিবে না, কারণ আমদানী বা রপ্তানী লোপ পাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও দেশ হইতে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার ভুট্টা রপ্তানী হইত; এখন কিছু নাই বলিলেই হয়।

তণ্ডুলের মধ্যে চাউল, গম (ও আটা ময়দা) বাদ দিলে, ভুট্টা, যব যোয়ার, বাজরা, জই মিলিয়া মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার রপ্তানী হয়। কিন্তু ছোলা, দ্বিদল বা ডাল ও বিবিধ কলাই মিলিয়া সওয়া এক কোটী টাকার হয়; ইহার মধ্যে ছোলা ও মসুর ডালের রপ্তানী উল্লেখ যোগ্য।

আমদানীর মধ্যে চাউলই সর্ব্বপ্রধান; ইহাকে বাদ দিলে, আর বিশেষ কিছুই থাকে না। যব, যোয়ার এবং নানাবিধ কলাই মিলিয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকাও হয় না; সে স্থলে চাউলের আমদানী এগারো কোটী টাকা। ব্রহ্মই ভারতে চাউল এবং কলাইয়ের একমাত্র বিক্রেতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা হইতে বীজের স্বতন্ত্র রপ্তানী আছে; এবং তাহা হইতে তৈল লাভের জন্যই বিদেশীরা এত অধিক পরিমাণ ক্রয় করে। পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ধান্য বা ধান (Rice)

ধান্য ও চাউল

সুস্থ ও সবল শরীর গঠনোপযোগী উপাদান হিসাবে ভাতের নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কখনও শোনা যায়, উহাতেই পুষ্টিকর সকল বস্তুই পাওয়া যায়, আবার কেহ বলেন উহার এরূপ কোনই মূল্য নাই, কেবল তাপ সৃষ্টি করে, মেদ বৃদ্ধি করে মাত্র; উহাতে আমিষজাতীয় পদার্থের একান্ত অভাব, অতএব পরিত্যাজ্য। যিনি যাহাই বলুন, ভাত এসিয়াবাসীর অধিকাংশের প্রধান খাদ্য। শীত, তাপ ভেদে নানাদেশে নানারূপ খাদ্যের রীতি প্রচলিত। শীত প্রধান দেশে স্নেহ বা তৈল-প্রধান খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে দেহের তাপ রক্ষার দারুণ অসুবিধা হয়। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তৈল বিহীন বা স্বল্প স্নেহশালী পদার্থ ভোজনই শ্রেয়ঃ।

সাধারণ ভোজ্য তণ্ডুলের মধ্যে ধান্য বা চাউলে তৈলের ভাগ নিতান্ত কম থাকায় এসিয়া অঞ্চলে ভাতের বেশী প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে পুষ্টির প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই সহজপাচ্যভাবে সন্নিবেশিত আছে, ইহাই নাকি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত সত্য।

বাঙ্গালীদের মধ্যে মাড় ফেলিয়া সিদ্ধ চাউল ভোজনের যে রীতি আছে তাহা খাদ্যবস্তু হিসাবে কতকপরিমাণে শক্তিহীন হয় এবং কলে ছাঁটা চাউলে খাদ্যপ্রাণ বা জীবনীশক্তি লুপ্ত হইয়া তাহা অসার হইয়া পড়ে—ইহা পরীক্ষিত সত্য। কাঁড়া, আকাঁড়া চাউল ও পরিত্যক্ত আবরণ বা কুঁড়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণ-দ্বারা দেখা দিয়াছে যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য নির্ব্বাচনে নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকি। নিম্নের বিশ্লেষণ ফল হইতে ইহা কতকপরিমাণে সুস্পষ্ট হইবে:

খাদ্য ও পুষ্টি

	Protein আমিষ	Fat স্নেহ	Starch শালী	Phosphate খনিজ
আকাঁড়া	৭·৩৭	৩·৩০	৭২·৪৯	·২২৯৬
কাঁড়া	৬·৫৬	২·৫০	৩৮·৩৭	·১০৬৪
খুদ বা কুঁড়া	১৫·৬৭	২০·৮৭	৩১·৪০	·১৫০৯

আমরা খাইতে চাই কাঁড়া চাউল, তাহার আবার মাড় ফেলিয়া, সুতরাং অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, বেরীবেরী প্রভৃতি না হওয়াই অস্বাভাবিক।

এই বৈজ্ঞানিক যুগে সিদ্ধ করিয়া আহার ছাড়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ধান বা চাউলের নানা ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে ভাতের মাদকতা শক্তি কতকপরিমাণে জানা ছিল এবং পচাই বা পাচই নামক মদ্য প্রস্তুত করিবার রীতি ছিল বা এখনও

আছে। চাউলের শালীজাতীয় (Starch) অংশের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার বহুল প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কারণে আহার্য্য হিসাবে রপ্তানী বাদেও, বোধ হয়, কেবল শ্বেতসারএর জন্য অনেক চাউল প্রতি বৎসর রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। চাউলের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়াতে নানা দেশে চাউলের চাষেরও প্রবর্ত্তন হইতেছে।

বাঙ্গলার চাষ

ভারতের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে কেবল যে বেশী পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা নহে, সমগ্র বৃটিশ ভারতের (করদরাজ্যসমূহ বাদে) তুলনায় বহু পরিমাণ জমিতে আবাদ হইয়া থাকে। ভারতের সমস্ত ক্ষেত্রের শতকরা ত্রিশ ভাগ জমিতে চাষ হইয়া, ফলনের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ এক বাঙ্গলাতেই হয়। পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলার মধ্যে ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় বেশী পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। চাষের জমির পরিমাণ হিসাবে জেলাগুলির স্থান এইরূপ ঃ

(১) ময়মনসিংহ, (২) বাখরগঞ্জ, (৩) মেদিনীপুর, (৪) ফরিদপুর, (৫) ত্রিপুরা, (৬) ঢাকা, (৭) রঙ্গপুর, (৮) নোয়াখালি, (৯) দিনাজপুর, (১০) খুলনা, (১১) রাজসাহী, (১২) ২৪ পরগণা, (১৩) পাবনা, (১৪) নদীয়া, (১৫) যশোহর, (১৬) চট্টগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাষের জমির পরিমাণ ও প্রতি একরে ফলন পরিশিষ্ট (খ) হইতে পাওয়া যাইবে।

একর হিসাবে চট্টগ্রামে আউশ ও শালি ধান এবং ময়মনসিংহে বোরো ধান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফলে।

সাধারণতঃ বাঙ্গলা দেশে তিনটী প্রধান ফসল পাওয়া যায়; যথা (১) বর্ষাজাত আশু বা আউশ; (২) গ্রীষ্মোদ্ভব, ষষ্টিক বা বোরো

এবং (৩) হেমন্তোদ্ভব আমন বা শালি। সরকারী মতে বিঘা প্রতি আন্দাজ ৫ মণ ধান হিসাব করা হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পাওয়া যায় না। আশু ধান্যের বীজ বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পর্য্যন্ত বপন করা হয়। বোরো একপ্রকার আশু ধান্য। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে সকল জমিতে স্বল্প জল জমিয়া থাকে এবং তাহাতে চাষ করিয়া লওয়া হয়, তাহাকেই বোরো ধান বলে। হেমন্তোদ্ভব, হৈমন্তিক বা আমন ধান অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে পাকে। ইহার আবার প্রধান দুই ভাগ আছে (১) ছোটনা ও (২) বড়ন। অধিক জলা জমিতে বড়ন বা বড়না ধান্য জন্মে। ছোটনা ধানের কতকগুলিকে আবার "শালি" ধান্য বলা হয়।

বাঙ্গলায় চাষের কাল

ভারতের এক প্রদেশের ধান্য বীজ অপর প্রদেশে জন্মায় না বা ফসল দেয় না এরূপও দেখা যায়; এবং যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে আন্দাজ ৫,০০০ জাতীয় ধান্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যদি অর্দ্ধেকও প্রচলিত থাকে তাহাও নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

বাঙ্গলার পরই মদ্র, পরে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, তৎপরে আসামের স্থান। এই সকল প্রদেশে আবার কোন্ কোন্ জেলায় বেশী চাষ হয় তাহাও জানা দরকার—

মদ্র—এখানে মোটামুটি ১ কোটী ১০ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে চাষ হয়। তন্মধ্যে ভিজাগাপট্টম ও তাঞ্জোরে প্রতি জেলায় ১১ লক্ষ একরের উপর এবং গঞ্জামে পৌণে ১১ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হয়। পরে মলবার, চিঙ্গলপুট, পূর্ব্ব গোদাবরী, উত্তর আর্কট্, কৃষ্ণা, নেলোর, গণ্টুর প্রভৃতি জেলার স্থান।

অন্যান্য প্রদেশের চাষ

বিহার—রাঁচি, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, মজঃফরপুর, গয়া, দ্বারবঙ্গ, সম্বলপুর, চম্পারণ, পূর্ণিয়া, সাহাবাদ ইত্যাদি। রাঁচি, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইহার প্রতি জেলাতেই নয় লক্ষ একরের অধিক জমিতে চাষ হয়।

যুক্তপ্রদেশ—গোরক্ষপুর, বস্তি, গণ্ডা, বহরাইচ, আজমগড়, ফয়জাবাদ সুলতানপুর, বিজনৌর, রায়বেরিলী, খেরী, মির্জ্জাপুর, ইত্যাদি। গোরক্ষপুর, বস্তি, গণ্ডা প্রভৃতি জেলায় জমির পরিমাণ প্রত্যেকটীতে ৯ লক্ষ একরের উপর।

আসাম—শ্রীহট্ট, কামরূপ, শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, ডারাং, নওগাঁ, লক্ষ্মীপুর ইত্যাদি। শ্রীহট্টে চাষ হয় ১৫ লক্ষ একরের উপর জমিতে।

মধ্যপ্রদেশ ও বিরার—রায়পুর, বিলাসপুর, দ্রুগ। রায়পুরে ১৬ লক্ষ এবং বিলাসপুরে ১৩ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়।

উড়িষ্যায় কটক এবং পুরী দুই জেলাতেই প্রচুর চাষ হয়। কটকে জমির পরিমাণ ১০ লক্ষ একরের উপর। বালেশ্বরের, চাষ উপেক্ষণীয় নহে।

অন্যান্য প্রদেশের কোনও জেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য চাষ হয় না।

পৃথিবীর মধ্যেও একর হিসাবে ভারতে ধান্যের চাষ বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। যে সকল দেশে বেশী ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কয়েকটীর নাম দেওয়া হইল। জমি ও ফসলের পরিমাণ পরিশিষ্ট (গ) হইতে পাওয়া যাইবে। নিম্নলিখিত দেশগুলিতে খুব বেশী চাষ হয়ঃ—

পৃথিবীর চাষ

ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, শ্যাম, ফরমোশা, কোরিয়া, মিসর প্রভৃতি।

অন্যান্য দেশে চাষ হয় না এরূপ নয়, তবে উক্ত দেশসমূহে যে ধান্য

উৎপন্ন হয়, তাহাই পৃথিবীর প্রয়োজন বহুলাংশে পূর্ণ করিয়া থাকে। তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, যে মহাদেশ এসিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশের স্থানসমূহে ধান্য উৎপাদনের উপযোগী জমি ও আবহাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় অন্যান্য স্থানেও ধান চাষের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং কম পরিমাণ জমিতে ইটালী, মিশর প্রভৃতি দেশ বহু ধান্য উৎপাদন করে। জাপান প্রতি একরে ৩৩৬০ পাউণ্ড ধান পায়; ইটালী ৪০৩২ আর সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে একরে ১২৯৯ পাউণ্ড ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার প্রতি একরে যথাক্রমে ৮৮১ ও ১০৮৭ পাউণ্ড **চাউল** পাওয়া গিয়াছে (১৯৩৬—৩৭)। গত পাঁচ বৎসরের হিসাব পরিশিষ্টে (ঘ) দেখানো হইল।

বাঙ্গলায় যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা তাহার সকল অধিবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। সমগ্র ভারতের হিসাব ধরিলেও উহা কতক পরিমাণে সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও ভারত হইতে প্রতি বৎসর অনেক চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স-তুঁষ, তুঁষহীন, ভাঙ্গা-পরিচ্ছন্ন বা মাজা ও বিবিধ এই চারিটী নামে ধান ও চাউল ভারতের বাহিরে চালান যায়। ইহাদের মোট পরিমাণ ২,২৮,১৬৪ টন ও তাহার মূল্য ২,৬১,৮১,০০০৲ টাকা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এই পরিমাণ খুব বেশী ছিল, কারণ তখন ভারতবর্ষ অর্থে ব্রহ্ম দেশকেও সঙ্গে লওয়া হইত। পরিশিষ্টে (ঙ) কোন্ প্রকার চাউলের কত অংশ পড়িয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে।

চাউলের রপ্তানী

ভারত হইতে যে চাউল রপ্তানী হইয়া যায় তাহার অংশ সকল প্রদেশের সমান নহে। বাঙ্গলা ও মদ্রে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী ধান ফলে, সে কারণে অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা এই দুই দেশ হইতে

চাউলের রপ্তানী বেশী হইয়া থাকে। পরিশিষ্টে (চ) এই অঙ্ক দেওয়া হইল।

ভারত হইতে **ধানের** রপ্তানী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চাউলের মধ্যেও সিদ্ধ চাউল যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ সর্ব্বরকমের মিলিত ২ লক্ষ ২৮ হাজার টনের মধ্যে সিদ্ধ চাউল ২ লক্ষ ৪ টন।

যাহারা চাউল লয় তাহার মধ্যে সিংহলের স্থান প্রথম। সমস্ত রপ্তানীর শতকরা ৪০ ভাগ সিংহল লইয়া থাকে। পরে আরব্য, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য, মরিসস্, এদেন, বাহেরিণ প্রভৃতি দেশ লয়। পরিশিষ্ট (ছ) দ্রষ্টব্য।

আমদানী

ভারতে বহু চাউল আমদানী হইয়া থাকে। যখন ব্রহ্ম পৃথক হয় নাই, তখন স্বতন্ত্র অঙ্ক না থাকায় এই আমদানীর পরিমাণ সাধারণ লোকে জানিতে পারিত না। ১৯৩৫-৩৬ সালে এই পরিমাণ ৬৭ লক্ষ টাকা ছিল; পর বৎসর ১৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে ইহা এগারো কোটী টাকাতে উঠিয়াছে, কারণ ব্রহ্ম হইতে ১০ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকার আমদানী দেখাইতে হইয়াছে। পরিশিষ্ট (জ) দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজন হিসাবে বিভিন্ন বন্দরে বিভিন্ন পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় বহু ধান জন্মে বলিয়া বাঙ্গলার প্রয়োজন তত বেশী নয়। মদ্রে চাউল খুব বেশী হইলেও মদ্রের বন্দরে চাউলের আমদানী খুব বেশী; কারণ মদ্রে ফসলের তুলনায় লোকে অধিক পরিমাণে রপ্তানী করিয়া ফেলে। পরিশিষ্ট (ঝ) দ্রষ্টব্য।

চাউল ও ধানের এ রপ্তানীর এক কারণ বোধ হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপান্তরিত চাউলের নানারূপ ব্যবহার। গম, যব প্রভৃতি ধান্য জাতীয় আর যে সকল তণ্ডুল হয়, তন্মধ্যে ধান্য বা চাউলে সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক পরিমাণে শালীজাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ শ্বেতসার (Starch), আছে। আলুর ষ্টার্চ্চও প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা চাউলের ষ্টার্চ্চের মত অনেক বিষয়েই উপযোগী নহে। চাউলে শতকরা ৭৬ হইতে ৮০ ভাগ, গমে ৬৫ হইতে ৭০, ভুট্টায় ৬৮ হইতে ৭০, বার্লিতে ৫৮ হইতে ৬৪ এবং আলুতে মাত্র ২০ ভাগ শ্বেতসার পাওয়া যায়। উপরিলিখিত কয়েকটী তণ্ডুল ও মূল হইতে জগতের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার সংগৃহীত হইয়া থাকে।

আধুনিক ব্যবহার

চাউল মনুষ্যের খাদ্য, পশুতে যে খায় তাহাও বলা বাহুল্য, অবশ্য খুদ-কুঁড়াই তাহারা বেশী পায়। ভাত ও চাউল গাঁজাইয়া নানারূপ মদ হয়, এবং চোলাই (distillation) দ্বারা সুরাসার, বিয়ার, হুইস্কি নামক মদ্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। আমরা যে ভিনিগার বা সিরকা দেখি,: তাহাও রূপান্তরিত ভাত মাত্র। মোটা তণ্ডুলে বেশী মাত্রায় শ্বেতসার বা শালীজাতীয় পদার্থ থাকাতে ব্যবহারিক ষ্টার্চ্চের জন্য উহার প্রচলন খুব বেশী। এই কারণেই উহা জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অধিক মাত্রায় গিয়া থাকে। ষ্টার্চ্চ হইতে শ্বেতসার শর্করা (Starch sugar), ডেক্সট্রোজ, (Dextrose), ম্যালটোস্ (Maltose), ক্যারামেল (Caramel or burnt sugar) ইত্যাদি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ডেক্সট্রিন লাগে তূলা-জাত বস্ত্রাদি কঠিন করিবার জন্য, যথা লেস্ (lace), মশারির কাপড়, বুননের কার্পেট এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য বস্তু। ধোপার মাড় সেইরূপ জামার হাতা, কলার, "ইস্ত্রি" করিয়া জামা প্রভৃতি কঠিন ও চক্‌চকে করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শিশিভরা নানারকম আঠাল পদার্থ (যথা, "Laye"

শ্বেতসার

Laikol ইত্যাদি, ইত্যাদি) শ্বেতসার হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সূতায় রং ধরাইবার জন্য বা ছাপার কাজ চালাইবার জন্য সূক্ষ্ম শ্বেতসার গুঁড়া রঙের সহিত মিশ্রিত করা হয়; উহাই আবার শিশি কৌটাভরা নানারূপ পথ্য (e. g. "British Cornflour") হইয়া এ দেশে চালান আসে। নারীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মুখের "পাউডার" হয়; ধাতু ঢালাই করিবার সময় ছাঁচের মধ্যে ঐ গুঁড়া ছড়াইয়া ঢালাইয়ের কাজ সুগম করিয়া লওয়া হয়। ধোঁয়াহীন বারুদ করিবার জন্য নাইট্রোষ্টার্চ্চ (Nitrostarch) সৃষ্টি করিয়া বারুদের অন্যান্য উপাদানের সহিত প্রভূত পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া জীবননাশের সহায়তা করিয়া থাকে। গ্লুকোজ (Glucose) করিতে, সুরাসার করিতে, শ্বেতসার হইতে কঠিন রস তৈয়ারী করিয়া আচার, মোরব্বা প্রভৃতি রক্ষা করিতে, চোলাই করিয়া বা মাতাইয়া (গাঁজাইয়া) তাহাদের সদ্ব্যবহার করিবার সুব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। চাউলের শ্বেতসারের আরও কত ব্যবহার আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ধানের খড় গবাদির প্রধান খাদ্য; ঘরের চাল ঢাকিতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং বর্ত্তমানে কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

তুঁষ

তুঁষ হইতে একপ্রকার রং হয় এবং জ্বালানী হিসাবে তুঁষ যথেষ্ট কাজে লাগে। জাপানীরা নাকি তুঁষ হইতে নকল সিল্ক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। মাটী পোড়াইয়া কালো রং করিতে এবং উহা পাথরের মতন কঠিন করিতে তুঁষের দ্বিতীয় নাই। পল্লীগ্রামে ক্ষীর ও নারিকেলের ছাঁচ ও ছাপা তৈয়ারী করিতে যে ছাঁচ লাগে তাহা ঐ তুঁষে পোড়ানো মাটী। তাহাতে কত শিল্পকলা প্রকাশ পাইত তাহা যিনি দেখেন নাই

তাঁহাকে লিখিয়া বুঝানো বড় কঠিন। দুঃখের বিষয়, আজকাল ঐ সকল ছাঁচ কাঠের উপর খোদাই হইতেছে; কিন্তু বলাই বাহুল্য যে কাঁচা শুষ্ক মাটীর উপর নরুণ প্রভৃতি দিয়া যে সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব ছিল, তাহা কাঠের উপর সম্ভব নহে।

এখন সময় আসিয়াছে যাহাতে আমরা চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া কারখানায় ধানের অপূর্ব্ব পরিণতি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি। জাপানের চাষের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আমরা এখন যেভাবে চাষ করি তাহা যে সম্পূর্ণ এ কালের অনুপযোগী তাহা স্বীকার করিতে হইবে। চাষের উন্নতি না করিতে পারিলে ধান চাষ হইতে আর লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে চাষের উন্নতি আমাদের দেশে হয় নাই, তাহার জন্য কাহাকে দায়ী করা যাইবে সে বিষয়ে আলোচনায় ফল নাই। নূতন সারে চাষ করিবার নূতন রীতি অবলম্বন করিলে ফসল বৃদ্ধি পাইবে; কোন্ জমিতে কি প্রকার ধান্য বেশী ফলে, তাহাও অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থির করা অসম্ভব নহে। ইহা আর ফেলিয়া রাখা যায় না।

চাষের উন্নতি

তাহার পর আমাদের আহার্য্য বিষয়ে আরও তত্ত্বানুসন্ধান করা প্রয়োজন হইয়াছে। ভাতই যখন আমাদের প্রধান খাদ্য, তখন যেভাবে ভোজন করিলে, শরীরের পূর্ণ পুষ্টি হয়, তাহা আমাদের জানিয়া লইয়া কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত। কেবল গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়া আমরা যখন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, অল্প মাত্রায় খরচ করিয়া যখন আমরা বেশী ফল পাইতে পারি, তখন কেন আমরা চাউলের পরিমাণ অবান্তর বেশী খরচ করি, তাহা বুঝিতে

আহার্য্যের পরিবর্ত্তন

পারি না। অভ্যাসবশে আমরা আকাঁড়া চাউল স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারি। প্রথমেই হয়ত কিছু অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অল্পায়াসেই তাহা আয়ত্ত করা যাইবে। আকাঁড়া চাউলের ব্যবহারে শরীরের পুষ্টি অল্প পরিমাণ চাউল দ্বারা সাধিত হইবে, সুতরাং গৃহস্থের সংসারে চাউলেব খরচ কমিয়া যাইবে এবং এইভাবে প্রতি বৎসর আমরা কেবলমাত্র যে বহু সার পদার্থের অপচয় রোধ করিতে পারিব তাহা নহে, চাউলের অত্যধিক অকারণ অপচয় বন্ধ করিতে সক্ষম হইব। আজ যাহারা অভাবে পড়িয়া খাইতে পায় না তাহাদের অনেকেই হয়ত একারণে দুমুঠা খাইতে পাইবে।

এখন নব যুগের হাওয়া বহিতেছে। মান্ধাতার আমলে আমরা যেখানে ছিলাম, হয়ত আজও সেইখানেই আছি। চাউল হইতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে এবং তাহা জগতের বাজারে যত টাকা খাটাইতেছে এবং যত লোকের অন্নের সংস্থান করিতেছে, তাহার সংখ্যা নগণ্য নহে। চাষী চাষ করে এবং তাহা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহাতেই যে কয়জন লোক কয়েকটী টাকার হাতফেরত করে মাত্র। আমাদের দেশে ষ্টার্চ্চ বাহির করিবার একটী কারখানা করা মোটেই কষ্টকর নহে। বিদেশে জাহাজ ভাড়া দিয়া চাউল যায়; রেল ভাড়া, অন্যান্য যান ভাড়া, কুলির মজুরি প্রভৃতি স্থলপথে বহু খরচ পড়িয়া যায়; তাহাতেও নূতন আকারে পরিণত চাউল কোটী কোটী টাকা বৈজ্ঞানিককে, ব্যবসায়ীকে আনিয়া দেয়।

নূতন লক্ষ্য

আমাদের দেশে বহু ধনী আছেন, যাঁহারা নিজেরাই এক একটী কল স্থাপিত করিতে পারেন; তাঁহারা করিবেন চাউল ছাঁটাইয়ের কল। বহু বিদ্বান বুদ্ধিমান্ আছেন, যাঁহারা যুক্ত-মূলধনে কারবার

করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা করিবেন মাত্র সাবানের কারখানা, গন্ধদ্রব্যাদির ব্যবসা, ইন্সিওরেন্স বা বীমা কোম্পানী—আর নয়ত বিলাতী মাল বিক্রয়ের আড়ত। যাহাতে এদেশজাত দ্রব্যাদি হইতে এদেশেই সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় উপস্থিত। টাকা পাঠাইয়া আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকারখানা আসিয়া পড়িতে পারে। ধন্য সেই বৈজ্ঞানিক যিনি প্রথমে চাউলের নানা ব্যবহার বুঝিয়া আবশ্যকীয় সব কলকারখানা গড়িয়াছিলেন; সে বুদ্ধি আমাদের কাহারও যখন নাই, তখন তাঁহাদের বুদ্ধির সদ্ব্যবহার আমরা করি না কেন? কারখানায় গিয়া সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি শিখিয়া আসিতে পারে এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজেরা কারখানায় কাজ করিতে পারে, সেইরূপ কয়েকটী অধ্যবসায়ী বুদ্ধিমান্ লোক দেশের মধ্যে নূতন প্রাণ, নূতন সন্ধান, উপার্জ্জনের নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া এ মরা দেশকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে।

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশ হিসাবে চাষ ও ফলন

১৯৩৬—৩৭

মোট জমি—৭,১৭,২৯,০০০ একর

মোট ফলন—২,৮৪,৮৮,০০০ টন **চাউল** *

প্রদেশ	জমির পরিমাণ হাজার একর	শতকরা অংশ	ফসলের পরিমাণ হাজার টন	শতকরা অংশ
ব্রিটিশ ভারত				
আসাম	৫৪,৪০	৭·৫	১৭,৯৩	৬·৩
বাঙ্গলা	২,১৯,৯৩	৩০·৬	১,০৬,৬৮	৩৭·৪
বিহার	৯৯,৪৯	১৩·৮	৩৩,৫৯	১১·৬
বোম্বাই	১৭,০৫	২·৩	৬৫৭	২·৩
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৫৬,২৪	৭·৮	১৭,৬৫	৬·২
মদ্র	৯৮,৯০	১৩·৭	৪৭,৯৪	১৬·৮
উড়িষ্যা	৫২,৬৩	৭·৩	১৬,৫২	১৫·৮
সিন্ধু	১১,৮২	১·৬	৪৫৫	১·৫
যুক্তপ্রদেশ	৬০,৮০	৮·৪	১৮,৫৩	৬·৫

* ভারতবর্ষের সরকারী মতে 'চাউল'-এর হিসাব রাখা হয়। অন্যান্য দেশে ধান্যের অঙ্ক দিয়া থাকে।

	জমির পরিমাণ হাজার একর	শতকরা অংশ	ফসলের পরিমাণ হাজার টন	শতকরা অংশ
করদ রাজ্য				
বোম্বাই	৪,৫৩	—	১৭৭	—
পূর্ব্ব এজেন্সী	১৯,৫০	২·৭	৫৬৬	১·৯
হায়দ্রাবাদ	১১,৩৫	১·৫	৪১৮	১·৪
মহীশূর	৭,২৪	·৯	২২৯	·৮

ব্রিটিশ ভারতে কুর্গ ও করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে বরোদা, ভোপাল, খয়েরপুর (সিন্ধু) ও রামপুর (যুক্তপ্রদেশ) রাজ্যেও কিছু কিছু ধান চাষ হয়।

(খ)

বাঙ্গলার জেলা হিসাবে জমির পরিমাণ

জেলা	হাজার একর	প্রতি একরে চাউল (পাউণ্ড) আউশ	আমন
(১) ময়মনসিংহ	২৩,৭৯	১,০৯৭	১,০৪৬
(২) বাখরগঞ্জ	১৭,৬২	১,১২৭	১,০৭৯
(৩) মেদিনীপুর	১৭,১২	১,১৩৮	১,০২২
(৪) ফরিদপুর	১১,৩৭	১,১২৩	৯৮৫
(৫) ত্রিপুরা	১১,০৫	১,০৬৪	১,০২০
(৬) ঢাকা	১০,৫৯	১,০৩৯	১,০২৩
(৭) রঙ্গপুর	১০,৫২	১,০০৩	১,০১৮
(৮) নোয়াখালি	১০,০৭	৯৭৯	১,০৪৫
(৯) দিনাজপুর	৯,২৯	১,২৩৭	১,০২২
(১০) খুলনা	৮,৪৮	১,১৬৯	৯৯০

(১১) রাজসাহী, (১২) ২৪-পরগণা, (১৩) পাবনা, (১৪) নদীয়া, (১৫) যশোহর, (১৬) চট্টগ্রাম, ইত্যাদি।

(গ)

পৃথিবীতে ধানচাষ

১৯৩৬—৩৭

মোট ফলন—ধান—১৩,৫০,৩০,০০০ টন

দেশ	হাজার টন	শতকরা অংশ	প্রতি একরে
ভারতবর্ষ	৪,৯৮,০০	৩৬·৮	১২৯৯
চীন	৪,৯২,৪০	৩·৬৪	২৪৬৪
জাপান	১,২৩,৭০	৯·১	৩৩৬০
ইন্দো-চীন	৬২,০০	৪·৫	১০৩০
ওলন্দাজ পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ	৫৬,৯২	৪·২	১৩০৪
কোরিয়া	৩২,৮৬	২·৪	১৭৫০
শ্যাম	৩২,১০	২·৩	১২৭৭
ফরমোসা	১৭,৬০	১·৩	২২৪০
ব্রেজিল	১১,৬০		১০০৮
আমেরিকা যুক্তরাজ্য	৯,৫০		২২৪০
ইতালী	৬,৮৫		৪০৩২
তুরস্ক	৬,৮০		২৬৭১
মিসর	৬,৭০		২৯১২

(ঘ)

প্রতি একরে চাউলের পরিমাণ

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
ভারতবর্ষ	৮৪১	৮৩০	৮২১	৭৫৭	৮৮১
বাঙ্গলা	৯৬৩	৮৯৭	৮৯৪	৭৬৫	১,০৮৭
মন্ত্র	১,০৫০	১,০১৭	১,০০৯	১,০৮৪	১,০৮৬

পাঁচ বৎসর জমি ও ফলনের পরিমাণ

	হাজার টন	হাজার একর
১৯৩২-৩৩	২,৯২,০১	৭,০১,৮০
১৯৩৩-৩৪	২,৫৭,২৩	৭,০৫,০৪
১৯৩৪-৩৫	২,৫৭,১৫	৬,৯৮,১৯
১৯৩৫-৩৬	২,৩২,১৩	৭,১০,০৫
১৯৩৬-৩৭	২,৮৪,৮৮	৭,১৭,২৯

(ঙ)

রপ্তানী বাণিজ্যে নানাপ্রকার চাউলের অংশ

	১৯৩৫-৩৬ টন	১৯৩৬-৩৭ টন	১৯৩৭-৩৮ টন
সতুঁষ (ধান)	১৬,৫৫২	৮,১৯১	৮৩১
সিদ্ধ চাউল	৬,৬৪,২৭৮	৬,৭৫,৮৪৩	২,০৪,৮২৭
" মাজা "	৭,১০,৭৯৫	৭,৫৪,২৬২	১৯,৮০৭
ভাঙ্গা মাজা "	১৩,২৪১	১৩,৮৯৬	২,৩৬০
বিবিধ	৫,৩০১	১০,০২৯	২৭৫

মূল্য—টাকা

সতুঁষ (ধান)	৮,৬৩,৬৮০	৪,৫০,৮৫৩	৪৯,৮৬৭
সিদ্ধ চাউল	৫,৬৪,৯৬,৮৩৩	৫,৮১,৬৭,৮৯২	২,৩২,০৫,২৬৪
" মাজা "	৫,১৮,৬৬,২৩২	৫,৫৮,৯৫,৮১৯	২৬,৭৩,১৩৫
ভাঙ্গা " "	৭,৯৫,০৪১	৯,৪১,২৪৪	১,৯৩,৫২৪
বিবিধ	৩,১৫,৯০৪	৭,৭১,৯৪৬	৫১,৯৭০
মোট—	১১,০৩,৩৮,৬৯০	১১,৭২,২৭,৮৫৪	২,৬১,৭৩,৭৬০

(চ)
রপ্তানীর অংশ—প্রদেশ হিসাবে

১৯৩৭-৩৮

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	১,০৫,৮৮৬	১,১৩,৯৪	৪৩.৬
বোম্বাই	৫,২৩৩	১১,৩০	৪.২
সিন্ধু	২৭,৮০২	৩০,৭০	১১.৭
মদ্র	৮৯,২৪৩	১,০৫,৫৭	৪০.৫

(ছ)
চাউলের ক্রেতার অংশ

১৯৩৭-৩৮

দেশ	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
সিংহল	১,০৬,১৮	৪০.৬
আরব্য	৩২,৩৬	১২.৪
দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য	২৮,৩০	১০.৮
মরিসস্	২১,০১	৮.০
এদেন	১৩,২২	৫.০
বাহেরিণ দ্বীপ	৯,৯৯	৩.৮
ষ্ট্রেটস্ সেট্ল্মেণ্টস্	৯,৭৮	৩.৭
কেনায়া, পেম্বা দিঃ	৪,৯৮	১.৯
ইংলণ্ড	৫,৬১	২.১
নেদারলণ্ডস্	৫,৭৮	২.২
ইত্যাদি, ইত্যাদি		

(জ)

ভারতে আমদানী চাউলের বিক্রেতার অংশ

১৯৩৭-৩৮

	ব্রহ্ম (হাজার টাকা)	অন্যান্য দেশ (হাজার টাকা)	মোট (হাজার টাকা)
সতুঁষ (ধান)	১৯,৫৯	১,৭৩	২১,৩২
তুঁষহীন (চাউল)	১০,৯৭,৮৫	৫২	১০,৯৮,৩৬
মোট—	১১,১৭,৪৪	২,২৫	১১,১৯,৬৮

(ঝ)

ভারতের প্রদেশ হিসাবে আমদানার অংশ

১৯৩৭-৩৮

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	১,৪৫,২২৩	১,১৯,২৪	১০·৮
বোম্বাই	৩,৭০,৭৬২	৪,৬০,৬৬	৪১·৯
সিন্ধু	১,৮৫৭	১,৭৩	·১৫
মদ্র	৬,৮০,২২১	৫,১৬,৭৩	৪৭·০

গোধূম বা গম (Wheat)

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত অর্থাৎ চাল, ধান। যাঁহারা বাঙ্গলার বাহিরে বিশেষ যান নাই, তাঁহারা হয়ত মনেই করিতে পারেন না যে বাঙ্গলার বাহিরে, ভাতের তত কদর নাই।

ভাত বনাম আটা

সিদ্ধ ধানের ভাত, আবার সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে মাড় বাদ দিয়া খাওয়া বোধ হয় বাঙ্গালার মধ্যেই নিবদ্ধ। বাহিরে আতপ চালের চলন বেশী এবং সিদ্ধ চাল হইলে, মাড় না ফেলিয়া খাওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু মোটের উপর ভাত খাওয়া অপেক্ষা রুটী, চপাটী, লেট্টি, থোকোয়া প্রভৃতি লোকে বেশী ব্যবহার করে এবং তাহার মূলে আছে আটা। আটার আবির্ভাব গম হইতে ; সুতরাং বাঙ্গলার বাহিরে লোকে গম চাষ করেও বেশী এবং ব্যবহার করেও অধিক পরিমাণে। খাদ্যের অংশ হিসাবে গমের স্থান, ধান অপেক্ষা অনেক উপরে। পরিপুষ্টির উপাদান গমে বেশী, বিশেষতঃ সহজ পরিপাচ্য আমিষাংশ গমে অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান। "ছাতুখোর" বা "ডাল-রুটী" ভোজী বলিয়া যাহাদের সাধারণ বাঙ্গালী তাচ্ছিল্য করে, হিসাব মত ধরিতে গেলে পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য নির্ব্বাচনে তাহারা বাঙ্গালী অপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় উহাদের শরীরের বলিষ্ঠ গঠন, সবল সুস্থ জীবন যাপনের এবং শ্রমসাধ্য বিপদসঙ্কুল পরীক্ষার ফলাফল হইতে। বাঙ্গলার মধ্যেও বহু অবাঙ্গালী আসিয়া জুটিয়াছে কিন্তু তাহারা মোটামুটী ডাল-রুটী ছাড়ে নাই, অথচ তাহারাও বাঙ্গালীর সঙ্গে এই ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত বাঙ্গলা দেশে একই আবহাওয়ার মধ্যেই বসবাস করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালীর সহিত তাহাদের আকৃতিগত বৈষম্য

বজায় রহিয়া গিয়াছে; তাহার কারণ বোধ হয় অনেকগুলির মধ্যে আটার ব্যবহার একটী। কলিকাতার সহরে হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, পেশোয়ারী, কাবুলী, শিখ প্রভৃতি ত অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের আকৃতির বিশেষ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজনও নাই, প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নয়; নামোল্লেখ করিয়া দিলাম মাত্র। শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যতালিকার মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় তাহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। অধ্যবসায়ের সহিত অনলস বা বিশ্রাম-বিহীনভাবে যে কাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন চালাইয়া যাইতে হয়, তাহাতে বাঙ্গালীকে কেহ ডাকে না। আর যাহাই কারণ হউক, এ শ্রমবিমুখতার মূলে আছে আমাদের অপটু দেহ এবং তাহার কারণ নিশ্চয়ই আমাদের ভুল আহার্য্য-তালিকা। বাঙ্গালীর মধ্যেও আবার যাহারা গম ব্যবহার করে, তাহারা চান মিহি ধবধবে সাদা ময়দা। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে লাল মোটা আটার তুলনায় সূক্ষ্ম ময়দার পুষ্টিকর শক্তি নিতান্ত কম।

বিভিন্ন জাতির পথ্য ও আকৃতিগত বৈষম্য

বাঙ্গলাতে আটা কম ব্যবহৃত হইবার আর এক কারণ, বাঙ্গলার মাটী ও চাষের অনুপযোগী অবস্থা পরম্পরা। বাঙ্গলায় গম চাষ অত্যন্ত কম হইয়া থাকে। সারা ভারতের জমির পরিমাণে বাঙ্গলায় চাষ হয় মাত্র '৫১, আর ফলন হয় তাহা অপেক্ষাও কম অর্থাৎ শতকরা '৪; ধানের বেলায় অবস্থা ঠিক এরূপ নহে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের সমস্ত জমির শতকরা ৩০'৬ (মোট ২ কোটী ৮৪ লক্ষ ৮৮ হাজার একর) জমিতে, শতকরা ৩৭'৪ (১ কোটী ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টন)

ধান ও গম

ফলন এক বাঙ্গলাতেই হইয়া থাকে। * গম সে হিসাবে যত চাষ হয়, ফল সে পরিমাণ ফলে না। ১ লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমিতে মাত্র ৪৬ হাজার টন গম হইয়া থাকে। পৃথিবীর বাজারেও ধান অপেক্ষা গমের ব্যবহার বেশী এবং জমি ও ফসলের পরিমাণ দুই-ই গমের অংশে অধিক মাত্রায় পড়িয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীতে ভাত অপেক্ষা গম খায় বেশী লোকে। অন্ততঃ সে হিসাবেও মনে করিতে হইবে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই পছন্দ করে কম।

গমের প্রথম চাষ

কোন্ আদিম কাল হইতে গমের চাষ আরম্ভ হইয়াছে তাহার হিসাব বলা বড়ই কঠিন এবং কোথায় ইহার প্রথম আবাদ হয়, তাহার সম্বন্ধে আজ কোন ধারণা করাও সহজ নহে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও গমের চাষের চলন ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতি আদিম ভাষাতেই গমের নাম আছে। চীনের "মায়া", হিব্রুতে "চিত্তা" আর সংস্কৃতে "গোধূম" আছে। অন্ততঃ ২৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্বে চীন দেশে গোধূমের চাষ হইত। মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের পর মৃৎপাত্রে সুরক্ষিত গোধূম বীজ পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের সভ্যতার হিসাব নির্ণয় এখনও স্থিরভাবে হয় নাই, তাহা হইলেও মনে হয় অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে গোধূমের চাষ প্রচলিত ছিল। Unger, মিশরের দাস্থর প্রদেশের, পিরামিডের ইষ্টকস্তূপের মধ্যে গোধূমবীজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে মনে হয় ৩৩৫৯ খৃঃ পূর্ব্বে সেখানে গোধূমের চাষ হইত। মোট

---

* চাউলের পরিশিষ্ট—(ক) দ্রষ্টব্য, ১৪ পাতা।

কথা, চাষ হিসাবে গোধূম বহুদিন হইতে লোকালয়ে চলিয়া আসিতেছে এবং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে গম, ধানেরই সমসাময়িক তণ্ডুল বিশেষ। জাতি হিসাবে ভারতের গোধূম অন্যান্য দেশের গোধূম অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না; পরন্তু অনেকে মনে করেন ভারতীয় গোধূমের চাষ অপরাপর দেশ অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং ফসলও ভাল হইত।

ধান যেমন ৫০০০ প্রকারের জন্মায় গম খুব পুরাতন চাষ হইলেও তাহার পার্থক্য অত সূক্ষ্মও নয়, সংখ্যাও এত বেশী নয়। ভাবপ্রকাশের মতে উহা তিন প্রকার, যথা, 'মহাগোধূম' অর্থাৎ বৃহৎ তণ্ডুল, 'মাধুলী' বা মধ্যতণ্ডুল এবং নিঃশিখ' বা শিখাবিহীন অর্থাৎ লম্বা শোঁয়াবিহীন। বৈজ্ঞানিকেরা আবার নানারূপ বিভাগ করিয়াছেন; তাঁহারা তণ্ডুলের গুণাগুণের উপর বিভাগ নির্দ্দেশ করেন। মোটামুটি রঙ হিসাবে সাদা ও লাল এই বিভাগেই প্রচলিত। আবার ঐ দুই জাতির প্রত্যেকটীর মধ্যে কঠিন ও কোমল বা মোলায়েম দানা বলিয়া আরও দুইটী ভাগ করা হইয়াছে। মোলায়েম দানার নাম "পিস্‌সি"; প্রধানতঃ ইহাই রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় এই গুণ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। নরম সাদা জাতির নাম, দুধিয়া; নরম লাল, জামালি; কঠিন ধূসর, গঙ্গাজলী এবং কঠিন লাল, খেরী। পিউসা ও নানবিয়া নামে আরও দুই প্রকার গোধূমের চলন বাঙ্গলা দেশে আছে, কিন্তু উহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। মোট কথা গোধূম কমবেশ ৩০০ রকমের জানা গিয়াছে।

জাতির বিভিন্নতা

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ আশ্বিনের একেবারে শেষ ভাগ হইতে পৌষের শেষ অবধি গম রোপণ করা হইয়া থাকে এবং চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ নাগাদ

ফল সুপক্ক হইলে কাটিয়া লওয়া হয়। কিন্তু গমের চাষ এত রকমের হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে লোকে স্থান হিসাবে চাষের কালের এত বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়াছে, যে ফলে প্রায় সারা বৎসরই গমের চাষ হইয়া থাকে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিতে চলিতে গমের অঙ্কুর অবস্থা হইতে পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত সবই দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পঞ্চনদ প্রদেশে লোকে জমি তৈয়ারী করে, কঙ্কন প্রদেশে সেই সময় পরিণত গম তুলিতে দেখা যায়; মহীশূরে ও মদ্রে তখন গম রোপণ চলিতেছে।

চাষ আবাদ

জগতের বাজারে ইহাতে বিশেষ সুফল হইয়াছে। নানা দেশে নানা সময়ে গম রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত হয়; তাহার ফলে কোনও সভ্য এবং স্বাধীন দেশে হঠাৎ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে অফলা হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বাজারে প্রাপ্য গম কিনিয়া উহা দূরীভূত হইয়া থাকে। জানুয়ারীতে নিউজিলণ্ড, আর্জেণ্টাইন এবং অষ্ট্রেলেশিয়া; ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চে পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জ; এপ্রিলে মেক্সিকো, মিশর, পারস্য এবং এসিয়া মাইনর; মে মাসে টেক্সাস্, চীন, জাপান এবং উত্তর আফ্রিকা; জুনে কালিফোর্ণিয়া, স্পেন, ইটালী এবং দক্ষিণ ফ্রান্স; জুলাই মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, উত্তর কানাডা, হাঙ্গেরী, দক্ষিণ জার্ম্মেণী এবং উত্তর ফ্রান্স; আগষ্ট মাসে পশ্চিম কানাডা, পশ্চিম রুষ এবং উত্তর জার্ম্মেণী; সেপ্টেম্বরে স্কটলণ্ড, স্কাণ্ডিনাভিয়া এবং উত্তর রুষ; নভেম্বরে পেরু এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ডিসেম্বরে ভারতবর্ষ—বাজারে গম আনিয়া হাজির করে। ভারতবর্ষের এবিষয়ে সুবিধা আছে, ডিসেম্বরের বাজারে ভারতীয় গম প্রায় একাই আসিয়া উপস্থিত হয়।

গমের বাজার

জমির উর্ব্বরাশক্তি, বৃষ্টি, তাপ প্রভৃতি মিলিয়া একই মাপের

জমিতে নানা দেশে ফসলের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও মনুষ্যগত জ্ঞানের উপরেও ফসল বহুল অংশে নির্ভর করে। জমির উৎপাদিকা শক্তি, তাহার সারের প্রয়োজনীয়তা, চাষের যথাকাল নির্ণয় করিতে যাহারা জানে তাহারা পরিশ্রমের পুরস্কার বেশী মাত্রায় পাইয়া থাকে। নানা কারণে আবার দুই এক বৎসরের চাষ কম হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর হিসাব করা চলে না। পরিশিষ্ট (ঘ) হইতে দেখা যাইবে নানাদেশে একর প্রতি ফলনের বিশেষ বিভিন্নতা আছে। ডেনমার্ক, আয়র্লণ্ড, বেলজিয়ম, জাপান, অষ্ট্রিয়া ও কোরিয়ায় চাষের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও তাহারা প্রমাণ করে যে অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানদ্বারা কিরূপ উন্নত ধরণের চাষ করা সম্ভব হইয়াছে।

জমি ও ফলন

ভারতবর্ষেও যে সকল স্থানে গোধূমের চাষ হইয়া থাকে, তাহারও ফলনে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে চাষ হয়, মোট ৩ কোটী ৩২ লক্ষ ৩৭ হাজার একর জমিতে, আর ফলে ৯৮ লক্ষ ১৮ হাজার টন। তন্মধ্যে ব্রিটিশশাসিত ভারতের ভাগে ২ কোটী ৫০ লক্ষ ৫১ হাজার একর জমি অর্থাৎ মোট জমির ৭৫·৩% পড়ে। ফলনের হিসাবে আরও একটু ভাল দেখা যায়। ৭৯ লক্ষ ১৯ হাজার টন অর্থাৎ মোট পরিমাণের ৮০·৬% ফল পাওয়া যায়।

ভারতের ফসল

ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাব প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাষ ও ফলন হয়। জমির শতকরা ২৮·১ ভাগ ও ফলনের ৩৪·৫% উক্ত প্রদেশে হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিরার পঞ্জাবের পরেই স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই তিনটী প্রদেশেই সারা ভারতের

কমবেশ শতকরা আশী ভাগ ফলন হইয়া থাকে। গম চাষে বাঙ্গলার স্থান প্রায় সর্ব্বনিম্নে। পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

সকল প্রদেশে সমান ফসল পাওয়া যায় না। দিল্লী ও বিহারে একর প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রতি একরে যথাক্রমে ৮৭৮ ও ৮৬৩ পাউণ্ড। পঞ্চনদ, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশেও বহু পরিমাণ গম ফলে। পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলার চাষ

বাঙ্গলার ভিতর মালদহে গমের চাষ অধিক হইয়া থাকে; বাৎসরিক হিসাবে ১ লক্ষ ২৭ হাজার একরের মধ্যে ঐ স্থানে ৪৫,৫০০ একর চাষ হয়। পরে পরে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী, ঢাকা, পাবনা, বাঁকুড়ার স্থান। বীরভূম, দার্জ্জিলিং, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি স্থানেও কতক কতক গমের চাষ হইয়া থাকে। প্রতি একরে ফসলের পরিমাণ ধরিলে রাজসাহীর স্থান সর্ব্বোচ্চে; সেখানে একরে ৯১৯· পাউণ্ড গম ফলে। পরে যথাক্রমে রংপুর, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, বীরভূম, মালদহ, ঢাকা, পাবনা, নদীয়া, দার্জ্জিলিং, দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের স্থান। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় গমের চাষ ও ফলন যে কম হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন প্রদেশে গম চাষ

পঞ্চনদে চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, জেলা ফিরোজপুর গম চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। এই এক জেলাতেই ছয় লক্ষ একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে। পাঁচ লক্ষ একরের উপর চাষ হয় জেলা আটক ও মূলতানের প্রত্যেকটীতে; চার লক্ষ একরের উপর জমিতে চাষ হয় সাহপুর, মণ্টগোমেরী প্রত্যেক জেলায়। পরে গুরুদাসপুর, গুজরাণওয়ালা, ঝঙ্গ, লাহোর প্রভৃতি জেলার স্থান।

যুক্তপ্রদেশের মধ্যে গোরক্ষপুরের স্থান সর্ব্বপ্রথম; সেখানে চার লক্ষ একরের বেশী জমিতে গম চাষ হয়। মীরাট, বস্তি, বুদাঁও, বহরৈচ, গণ্ডা, মজঃফরপুর, সীতাপুর, সাজাহানপুর, হর্দ্দৈ, এটোয়া প্রভৃতি জেলাতে খুব বেশী চাষ হয়।

মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে সগর প্রধান স্থান অধিকার করে; সেখানে সাত লক্ষ ষাট হাজার একর জমিতে চাষ হয়। পঞ্চনদের ফিরোজপুর অপেক্ষাও এখানে বেশী চাষ হয়। পরে হোসাঙ্গাবাদ, চিন্দবারা, জব্বলপুর, নাগপুর প্রভৃতির স্থান।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে গম চাষ খুবই বেশী হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভারতের স্থান তৃতীয়। সকল বৎসরই যে এই অবস্থা সমান থাকে তাহা নহে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে আর্জেণ্টাইন প্রচুর গম চাষ করে, কিন্তু গত কয়েক বৎসর নৈসর্গিক কারণে চাষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হয়ত জলবায়ু আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সহিত কোনও দেশ কোনও বিশেষ চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতে পারে।

পৃথিবীর চাষ ও ফলন

মোটামুটী পৃথিবীর ফলন ১২ কোটী ৫৭ লক্ষ ২১ হাজার টন। অবশ্য এ হিসাব যে নিখুঁত নহে, তাহা বলা বাহুল্য। শতকরা ৫ ভাগের তারতম্য নিশ্চয়ই হয়। এখন দেখা যাউক, ধরার হাটে কে কত ফলন করে এবং কাহার অংশে কতটা পড়ে। রুষগণতন্ত্রের স্থান পৃথিবীতে প্রধান, অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত ফলনের সিকি। পরে পরে চীন, আমেরিকা যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, কানাডা, আর্জেণ্টাইন, ইটালী, জার্ম্মেণী, অষ্ট্রেলিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, স্পেন, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী ইত্যাদি। পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য।

তিন বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ছিল না, কিন্তু জগতে গমের ফলন কম হইতে আরম্ভ হওয়ায়, বিশেষতঃ আর্জ্জেণ্টাইনার চাষ মন্দা হওয়ায় ভারতের গমের চাহিদা বাড়িয়াছে। তাহার উপর ইউরোপে পূর্ণোদ্যমে সমরায়োজন চলিতেছে, এবং ইংরাজ এই হাঙ্গামার মধ্যে নিজের আহার্য্য সম্বন্ধে সতর্ক হইতেছে। তাহাতে ৫ কোটী টাকার উপর গম ও আটা রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। আবার যখন তাহাদের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে, তখন এই গম লইয়া চাষী বিপন্ন হইয়া পড়িবে। পরিশিষ্ট (ঙ) দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্য

ইংরাজ একা প্রায় তিন কোটী টাকার গম লইয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসরই ইংরাজ আমাদের প্রধান খরিদ্দার। জার্ম্মাণী দেড় কোটী টাকার গম লইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যান্য বৎসরে মিসর, এদেন প্রভৃতি স্থানেও গম রপ্তানী হইয়া থাকে। পরিশিষ্ট (চ) দ্রষ্টব্য।

এই রপ্তানীর অধিকাংশই সিন্ধু বন্দর হইতে হয়; শতকরা ৯৮ ভাগ সিন্ধুর অংশে পড়িয়াছে। বাঙ্গলা ও বোম্বাই হইতে খুবই সামান্য গম বিদেশে চালান হইয়া থাকে। পরিশিষ্ট (ছ) দ্রষ্টব্য।

আটা ময়দা সুজি মিলিয়া কমবেশ নব্বই লক্ষ টাকার গিয়াছে। এখানে প্রধান ক্রেতা ব্রহ্মদেশ (৪৪·৬%); আরব, এদেন, ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্ প্রভৃতি কিছু কিছু গমচূর্ণ লইয়া থাকে। পরিশিষ্ট (জ) দ্রষ্টব্য।

এ ক্ষেত্রেও সিন্ধু বন্দরই প্রধান কেন্দ্র। শতকরা ষাট ভাগ এক সিন্ধুর অংশে পড়ে। বোম্বাই প্রায় একতৃতীয়াংশ চালান করে। পরিশিষ্ট (ঝ) দ্রষ্টব্য।

ভারতে বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণ গম ও আটা প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে। কোনও কোনও বৎসরে তাহা পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকারও উপরে উঠে। পরিশিষ্ট (এঃ) দ্রষ্টব্য।

আজ যাহারা গম বেচিয়া হাসিতেছে, হয়ত কালই তাহারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিবে। আন্তর্জাতিক ক্রয় বিক্রয়ের ফলে হঠাৎ কয়েকটা টাকা দেশে আসিয়া গিয়াছে। ইহার কতকটা চাষী নিজের গোলা হইতে দিয়াছে, কতকটা নূতন চাষ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহারা ঘরে গম জমিয়া গেলে তাহার অন্য ব্যবহার জানে না বা তাহার দেশের বৈজ্ঞানিকরা অজ্ঞ, সেখানে হঠাৎ যদি বিদেশী নিজের দেশে প্রচুর ফসল হেতু ভারতের গম না লয়, তাহা হইলে ক্ষেতে সোণা পড়িয়া থাকিলেও চাষীকে হাহাকার করিয়া উঠিতে হইবে। প্রতি দেশই চেষ্টা করিতেছে যাহাতে বাহিরের কোনও বস্তু দেশে আমদানী করিতে না হয়। আত্মনির্ভর হওয়া অপেক্ষা সুখ নাই। যাহাদের গমের চাষ বেশী হয়, তাহারা গম হইতে নানা বস্তু প্রস্তুত করে। জগতের বাজারে বিক্রয় করিয়াও তাহারা উদ্বৃত্ত রাখে, যাহাতে তাহাদের বৈজ্ঞানিকেরা অন্ন পায়, কলকারখানা রত্ন প্রসব করে, মজুরদের অন্নাভাব না হয়।

ভারতের চাষীর প্রকৃত অবস্থা

আটা-ময়দা-সুজি—আমরা ইহাই জানি গমের প্রথম ও শেষ ব্যবহার। সুজি যে গমের অন্যরূপ তাহাও আবার হয়ত অনেকে জানেন না। 'ড়হর' ডালের সঙ্গে যে 'রোট্টি' চলে তাহা আটা মোটা করিয়া ভাঙ্গা, তাহাতে আমিষ জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে এবং মহা উপাদেয় এবং শক্তিবর্দ্ধক বস্তু। মিহি আটা চালিয়া ময়দা বাহির হয়, প্রকৃতপক্ষে

গমের বিবিধ ব্যবহার

তাহার পুষ্টিকর শক্তি অতি কম। সুজিও মোটা আটার রূপান্তর। নানাবিধ বিস্কুট তৈয়ারী করিতে আটা লাগে, বার্লি বা যবই সে বিষয়ে প্রধান উপাদান। পিষিয়া কৌটা ভরিতে, তাহার শ্বেতসার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত করিয়া কাজে লাগাইতে, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যস্ত।

ম্যাকারোনি (Macaroni), ভার্ম্মিসেলি (Vermicelli), সেমোলিনা (Semolina), ইটালিয়ান পেষ্ট (Italian Paste), ছাড়ানো গম (Shredded Wheat), বল বা শক্তি ('Force'), গ্রেপ নট্‌স্ ("Grape nuts") প্রভৃতি গালভরা নামের বস্তু, গম ছাড়া আর কিছুই নয়। নূতন নামে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কৌটায় ভরা "বাবুদের" দেশে ইহারা অতি সমাদর পাইয়া থাকে। ঐ সকল ক্রেতাকে আটা খাইতে বলিলে অসুস্থ হইয়া পড়ে।

গমের শ্বেতসার বহু মূল্যবান বস্তু। চাউল, ভুট্টা প্রভৃতি গম অপেক্ষাও কোনও কোনও বিষয়ে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী। মদ ও চোলাই করা সুরাসার, গ্লুকোজ (Glucose), ডেক্সট্রোজ (Dextrose) প্রভৃতি শ্বেতসারের নানারূপ মূল্যবান বস্তু; চাটনী মোরব্বা প্রভৃতি রক্ষা করিবার "চিনির ঘনসার", শিশিভরা আঠা ও আঠাল বস্তু, চর্ম্মকারের প্রয়োজনের উপযুক্ত আঠা ("Shoe-makers' Paste") গমই সরবরাহ করে। নরম কাপড় শক্ত করিতে (যথা লেস্, ক্যালিকো, মশারি, পর্দ্দার কাপড়, কার্পেট) চাউল ও ভুট্টার শ্বেতসারের মত—গমের শ্বেতসারও ব্যবহৃত হয়; তবে অনুপাতে কম। আটা বা ময়দা জলে ভিজাইয়া ডেলা করিয়া তাহাকে বার বার জলে ধুইতে ধুইতে উহার মোটা অংশ বাহির হইয়া গেলে খুব সূক্ষ্ম অংশ পড়িয়া থাকে, তাহা চট্‌চটে অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন তাহাতে চূণ মিশাইলে কাষ্ঠ

শ্বেতসার

জোড়া দেওয়ার পক্ষে খুব ভাল আঠা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ তাহাকে "রোলাম" বলে; উহা একপ্রকার সিরীস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সকল গেল, আসল খাঁটী প্রথম শ্রেণীর শ্বেতসারের ব্যবহার। দ্বিতীয় স্তরের বা উদ্বৃত্ত শ্বেতসার (Secondary Starch) গবাদি পশুদিগের খাদ্যরূপে বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহার বিশেষ আদর আছে। ঔষধে ও পথ্যে, শিল্প ও কারুকার্য্যেও গমের সামান্য পরিমাণ ব্যবহার দেখা যায়।

গমের "খড়" শক্ত ঝুড়ি বুনিতে, চেয়ারের বসিবার আসন করিতে, মৌচাক ঝুলাইয়া রাখিতে বা চাক বাঁধিবার সুবিধা করিয়া দিতে, ঘর ছাইতে, শক্ত অথচ হাল্কা টুপী করিতে (Leghorn Hats), গবাদি পশুর খাদ্য যোগাইতে এবং রূপান্তরিত হইয়া সারের কাজে লাগিতে দেখা গিয়া থাকে।

খড়

গমের এত আদর কেন? তাহাতে সহজপাচ্য ভাবে আমিষাংশ থাকে শতকরা ৭ হইতে ২০ অংশ, শ্বেতসার ৬৫ হইতে ৭০, জলীয় অংশ সেলুলোস ও লিঙ্গোস (Cellulose, Lingose) ইত্যাদি আছে। আমরা জানিয়াও অন্ধ, আটা খাইতে চাই না, খাই ময়দা; শ্বেতসার বলিয়া মনে স্থান দিতে চাহি না, কারণ তাহার কোনও ব্যবহার আমরা জানি না। বিঘার পর বিঘা চাষ করিয়া যাই, ফলনের পরিমাণ কত হইতে পারে তাহার সংবাদও রাখি না। সার দিলে কত যে উন্নতি হয় তাহার সংবাদ রাখিবার প্রবৃত্তি নাই, আরও জানি যত ফলে ফলুক, জগতে কত প্রয়োজন হইতে পারে তাহার পরিমাণ না বুঝিয়া যথেচ্ছা চাষ করিয়া হা হুতাশ করিতে। এই সকল কারণেই ভারতের সম্পদ হিসাবে বলিলেও প্রকৃত পক্ষে সময় সময় এই সম্পদ চাষীর মহা আপদের কারণ হয়।

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশ হিসাবে চাষ ও ফলন

(১৯৩৬—৩৭)

মোট জমি—৩,৩২,৩৭,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত—২,৫০,৫১,০০০—৭৫·৩%

করদ রাজ্য—৮১,৮৬,০০০—২৪·৭%

মোট ফলন—৯৮,১৮,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত—৭৯,১৯,০০০—৮০·৬%

করদ রাজ্য—১৮,৯৯,০০০—১৯·৪%

প্রদেশ	জমির পরিমাণ	শতকরা	ফলনের পরিমাণ	শতকরা
ব্রিটিশ ভারত	হাজার একর	অংশ	হাজার টন	অংশ
বাঙ্গলা	১৪৯	—	৪৬	·৪
বিহার	১,১২৯	৩·৪	৪৩৫	৪·৪
বোম্বাই	১,৬৫৫	৪·৯	২৮৯	২·৯
মধ্যপ্রদেশ ও বিহার	৩,১৪০	৯·৪	৬০০	৬·১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,১০৫	৩·৩	২৮৭	২·৯
পঞ্চনদ	৯,৩৮৫	২৮·১	৩,৩৯২	৩৪·৫
সিন্ধু	৯৩১	২·৭	৩১১	৩·৪
যুক্তপ্রদেশ	৭,৪৮৪	২২,৫	২·৫৩২	২৫·৭

	জমির পরিমাণ হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলনের পরিমাণ হাজার টন	শতকরা অংশ
করদরাজ্য				
মধ্যভারত	১,৯১২	৫·৭	৩৪০	৩·৪
গোয়ালিয়র	১,৪২৩	৪·২	৩৩৪	৩·৪
হায়দ্রাবাদ	১,৩০৮	৩·৯	১০০	২·০
পঞ্চনদ	১,৪৬৮	৪·৪	৪৬৮	৪·৭
রাজপুতানা	১,২৮৪	৩·৮	৩৪৬	৪·৫

বোম্বাই, খয়েরপুর, রামপুর প্রভৃতি করদ রাজ্যে কতক পরিমাণে গম চাষ হইয়া থাকে।

(খ)

বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি একরে গমের ফলন

প্রদেশ	পাউণ্ড	প্রদেশ	পাউণ্ড
দিল্লী	৮৭৮	উড়িষ্যা	৭৬৮
বিহার	৮৬৩	সিন্ধু	৭৪৮
পঞ্চনদ	৮১০	বাঙ্গলা	৬৯২
যুক্তপ্রদেশ	৭৫৮	মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৪২৮
আজমীর	৭০৭	পঞ্চনদ	৭১৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫৮২	রাজপুতানা	৬০৪
করদ রাজ্য			
খয়েরপুর	৮৮৫	রামপুর	৬১৭

ভারতবর্ষে প্রতি একরে গড়ে ফলন

	১৯৩২-৩	১৯৩৩-৪	১৯৩৪-৫	১৯৩৫-৬	১৯৩৬-৭
ব্রিটিশ ভারত	৬৪৮	৬১১	৬৭৮	৬৭৭	৭০৮
করদরাজ্য	৫১৫	৪৯০	৫০২	৪৯০	৫২০
সমগ্র ভারত	৬৪২	৫৮২	৬৩২	৬২৮	৬৬২

(গ)

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার প্রতি একরে ফলনের পরিমাণ

জেলা	পাউণ্ড প্রতি একরে	জমির পরিমাণ একর
রাজসাহী	৯১১	৯,৯০০
মুর্শিদাবাদ	৮৪৭	৩৩,৬০০
মালদহ	৮৩০	৪৫,৫০০
ঢাকা	৭৯০	৮,০০০
পাবনা	৭৮৭	৭,৬০০
নদীয়া	৭৭৮	১৩,০০০
বাঁকুড়া	৬৫২	৫,৯০০

ইত্যাদি—

যে সকল জেলার নাম দেওয়া নাই, ঐ স্থানের জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নহে।

(ঘ)

পৃথিবীতে গম চাষ

মোট—১২,৫৭,২০,০০০ টন

দেশ	হাজার টন	শতকরা অংশ	প্রতি একরে ফলন-পাউণ্ড
রুষগণতন্ত্র	২,৯৭,২০	২৪.৪	৭৩৯
চীন	২,২৮,৪৯	১৮.১	৯১৮
আমেরিকা	১,৬৮,৭৯	১৩.৪	৭৩৯
ভারতবর্ষ	৯৬,৭২	৭.৫	৬২০
ফরাসী	৬৮,২৯	৫.৪	১১৮৭
আর্জেণ্টাইন	৬৬,৭৮	৫.৩	৯৩১
কানাডা	৬১,৭৬	৪.৯	৫৩৮
ইটালী	৬০,৫১	৪.৮	১০৩০
জার্ম্মাণী	৪৩,৮৩	৩.৫	১৭৯২
অষ্ট্রেলিয়া	৪০,৩০	৩.২	৬৯৪
তুরস্ক	৩৭,৩২	২.৮	৮৯৬
স্পেন	৩২,৭৩	—	৭৩৯
যুগোশ্লাভিয়া	২৮,৯৪	—	১১৪২
হাঙ্গেরী	২৩,৫৭	—	১৭৯২
চেকোশ্লোভাক	১৪,৯৭	—	১৪৩৩
ব্রিটেন	১৪,৮৯	—	১৭৯১

(ঙ)

রপ্তানী—গম, আটা, ময়দা

পরিমাণ

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
	টন	টন	টন
গম	৯,৫৯০	২,৩১,৫০৫	৪,৫৯,৮০৬
আটা ময়দা	১৮,০৩১	২৩,৬২১	৩২,২২৬

মূল্য

	টাকা	টাকা	টাকা
গম	৯,৪৮,০৭৬	২,০৯,৫৯,০০৯	৪,৬২,৩৯,১৬৪
আটা ময়দা	২২,২৬,৮৬৪	৩২,৪৮,২৮৪	৮৯,৪৫,৬৮৬
মোট	৩১,৭৪,৯৫০	২,৪২,০৭,২৯৩	৫,৫১,৮৪,৮৫০

(চ)

গম—ক্রেতার নাম ও অংশ

১৯৩৭-৩৮

মোট—৪,৫৯,৮০৬ টন

৪,৬২,৩৯,১৬৪ টাকা

দেশ	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	২,৯১,৩৯,৩০১	৬৩·০
জার্ম্মাণী	১,৪৭,৩০,৬১৫	৩১·৮
অন্যান্য	...	৫·২

(ছ)

গমের রপ্তানী—প্রদেশের অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

প্রদেশ	টাকা	শতকরা অংশ
সিন্ধু	৪,৫২,৩৩,১৭৪	৯৭.৭
বাঙ্গলা	৫,৪৪,৮৬৯	১.২
বোম্বাই	৪,৪৯,৯৬২	.৯

(জ)

আটা ময়দা—ক্রেতার নাম

মোট—৬২,২২৬ টন

৮৯,৪৫,৬৮৬ টাকা

দেশ	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	৩৯,৯৮,২৯৪	৪৪.৬
আরব	১২,৪৮,০৮৫	১০.৯
এদেন	৯,৯৯,৬২৯	১১.১
ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্ট	৬,০৪,৫২৬	৬.৭
সুদান, কেনায়া প্রভৃতি		

(ঝ)

আটা ময়দার রপ্তানী—প্রদেশের অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

প্রদেশ	টাকা	শতকরা অংশ
সিন্ধু	৫৪,০০,০০২	৬০.৩
বোম্বাই	৩১,২৩,২৪৩	৩৪.৯
বাঙ্গলা	৪,২০,৬৮২	৪.৭

(ঐ)

আমদানী—গম, আটা, ময়দা

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	টাকা
গম	২,৬৮৮	২৩,৭৪,২০২
আটা ময়দা	১৬৮	২৭,৯৯৭
বিবিধ	১৯,২৮০	১৩,১০,১৭৪
মোট	৪১,১৩৬	৩৭,১২,৩৭৩

যব (Barley)

বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই যব ও গমের গাছই দেখে নাই। ধানের সহিত সকলেই এবং ভুট্টার সহিত অনেকেই পরিচিত। আবার যবের সঙ্গে যত লোকের পরিচয় আছে, গমের সহিত তত লোকের নাই। পশ্চিম বঙ্গে সরস্বতী পূজার উপকরণের মধ্যে আম্রমুকুল ও যবের শীষ দেওয়া হয়, সে কারণে অনেকেই বালকাবস্থায় যবের সঙ্গে পরিচয় স্থরু করে। সাধারণ বঙ্গপরিবারে গমের আবির্ভাব একেবারে আটা, ময়দা ও স্থজিরূপে; স্থতরাং হঠাৎ কাহাকেও গম দেখাইয়া দিতে বলিলে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালীর সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও, গম যে ভারতের এক প্রধান খাদ্য তাহা অনেকেই জানেন। যবেরও স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ভারতবর্ষে ৬৪ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে যব চাষ হইয়া প্রায় সওয়া ২৩ লক্ষ টন ফসল হইয়া থাকে।

যবের ইতিহাস অতি পুরাতন; প্রাচীন সকল ভাষাতেই যবের উল্লেখ আছে। ২৭০০ খৃঃ পূঃ চীন সম্রাট সেন্-নুঙ্ যে পাঁচটী তণ্ডুল রোপণ করেন, যব তন্মধ্যে একটী—ইহাই যবের পুস্তকগত পুরাতন পরিচয়। মিশরের নানা স্মৃতিস্তম্ভে, সুইজারলণ্ড ও সাভয়ের অতি প্রাচীন প্রাচীর গাত্রে যবের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রতিচ্ছবিরূপে দক্ষিণ ইতালীর মেণ্টাপন্টিস্এর পদকে ছয় শ্রেণীযুক্ত যবই সর্ব্ব পুরাতন। এই পদকের কাল ন্যূনাধিক খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইন্দ্রযব, যব প্রভৃতি নাম ভারতে অতি প্রাচীন। কিন্তু যব আজ যে মূর্ত্তিতে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কোনও ধারণা শতাব্দীকাল পূর্ব্বেও কাহারও ছিল না। আজ বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া তাহা হইতে প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকার মাল প্রস্তুত হইতেছে।

পুরাতন কথা

ভারতবর্ষে কেবল ভোজ্য রূপেই যবের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কোনও কোনও স্থানে বা মৃদু মদ্য তৈয়ারী করিয়া পান করা হইয়া থাকে। ছাতু ও গমের সহিত মিশাইয়া রুটী তৈয়ারী করিয়া খাইবার জন্য যবের ব্যবহার প্রচলিত আছে। সে হিসাবে ভারতে যবের চাষ প্রচুর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ দিয়া চৈত্র বৈশাখ মাসে চাষ তোলা হয়। বোম্বাই অঞ্চলে যবের ক্ষেতে অন্য চাষ দেওয়া হয় না, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে যবের সহিত গম, ছোলা, কড়াই প্রভৃতি দেওয়া হয়। ক্ষেতের ধারে ধারে সরিষা, অড়হর প্রভৃতি চাষ দিয়া বেড়ার মত করা হইয়া থাকে। হাল্কা, দোআঁশ মাটীতে চাষ ভাল হইয়া থাকে; যবের জমিতে প্রায়শঃই সার কিছু দেওয়া হয় না। জমি তৈয়ার হইলে জল আনিবার জন্য আইলের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে

ভারতের চাষ—
জমি ও বীজ

বৃষ্টির জল পরিমাণমত পাওয়া যায়, সেখানে সেচের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ প্রতি একরে একমণ হইতে একমণ দশ সের পর্য্যন্ত বীজ লাগে।

ভারতের ফসল

ভারতবর্ষে, ব্রিটিশ ভারত ও করদ-রাজ্য মিলিয়া, ৬৪ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে যবের চাষ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরেই ইহার পার্থক্য হয়, তাহা নিশ্চিত। ঐ জমিতে ২৩ লক্ষ ১৩ হাজার টন ফল হইয়াছে।

	জমির অংশ	ফলনের অংশ
	%	%
বৃটিশ ভারত	৯৯'৪	৯৯'৮
করদ রাজ্যসমূহ	'৬	'২

হিসাবমত করদ রাজ্যসমূহে যবের চাষ কিছুই হয় না, বৎসরে আন্দাজ দুই হাজার টন ফল হইয়া থাকে।

বৃটিশ ভারতের মধ্যে নানা স্থানে চাষের তারতম্য আছে। যুক্ত-প্রদেশে সমস্ত চাষের জমির প্রায় তিনভাগ ও তদপেক্ষা বেশী ফলন হইয়া থাকে। ৬৪ লক্ষ ৬২ হাজারর একরের মধ্যে একা যুক্তপ্রদেশে ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার একর পড়ে; আর ফলনের বেলায় ২৩'১৩ লক্ষ টনের মধ্যে ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টন ফলে। পরিশিষ্টে (ক) প্রদেশ ও জমি ও ফলনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্রষ্টব্য।

প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় চাষ

প্রতি প্রদেশে জেলা হিসাবে জমিতে কম বেশী চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় মুর্শিদাবাদে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে চাষ হয়। অর্থাৎ ১৯,৪০০ একর। পরে মালদহ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নদীয়া, বাঁকুড়া ইত্যাদি।

যুক্তপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার স্থান সর্ব্বোচ্চে অর্থাৎ (৩,৩৫,৯৬০ একর)। পরে পরে আজমগড়, জৌনপুর, এলাহাবাদ, আলিগড়, প্রতাপগড়, উনাও, কাণপুর, হর্দ্দৈ, গাজিপুর, বুলন্দসর, বালিয়া, বস্তি, কাশী, মির্জ্জাপুর, সীতাপুর জেলা (১,০৯,৯২৫ একর) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিহারে মজঃফরপুর জেলাতেই ৪,৬০,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে; ভারতের মধ্যে মাত্র একটী জেলায় ইহা অপেক্ষা অধিক যব চাষ আর কুত্রাপি হয় না। দ্বিতীয় চম্পারণ, তৃতীয় সারণ, চতুর্থ সাহাবাদ, পঞ্চম দ্বারভাঙ্গা, ষষ্ঠ মুঙ্গের জেলা (৮১,৯০০ একর) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পঞ্চনদে গুরুগাঁ জেলা প্রধান (৯৬,৯৪০ একর); পরে পরে হিসার, কাঙ্গড়া, শিয়ালকোট, মজঃফরগড় (২৩,১০০ একর) ও অন্যান্য জেলার স্থান। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে পেশোয়ার (৮৪,৭০০ একর) ও হাজরা জেলা উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীতে যব চাষ

মল্ট্ (Malt) বলিতে যে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর বস্তু বুঝা যায়, তাহা যবের রূপান্তর মাত্র। যথাস্থানে ইহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে। মল্টের কারণে পৃথিবীতে যবের অত্যন্ত সমাদর এবং সকল দেশেই কিছু কিছু যবের চাষ হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে মোট আট কোটী সাড়ে বত্রিশ লক্ষ একর জমিতে চাষের হিসাব পাওয়া যায়; তাহাতে ফসলের পরিমাণ মোট চার কোটী চৌদ্দ লক্ষ টন। নানা দেশের ভাগ্যে জমি ও ফলনের তারতম্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জমি ও ফলনের পরিমাণ এবং প্রত্যেকের শতকরা অংশ পরিশিষ্টে (খ) দেওয়া হইল।

জার্ম্মাণীতে জমির অনুপাতে ফলনের অংশ খুবই বেশী; স্পেনেও মন্দ নহে। তুরস্ক, পোলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী দেশেও জমির তুলনায় ফলন বেশী হইয়া থাকে। যদি জার্ম্মাণীর মত চাষ করিতে পারা যায়, তবে কম জমিতেও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে বেশী আয় হইতে পারে।

রপ্তানী ও আমদানী

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে যবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। যদি হঠাৎ কোথাও চাষ না হয়, হয়ত ভারত হইতে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা ছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু রপ্তানী হয়, আবার আমদানীও সামান্য হইয়া থাকে। পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য।

১৯৩৭-৮ সালে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল।

যে পরিমাণ যব রপ্তানী হইয়া থাকে, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ একা ইংরাজ লয়; পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য। তাহারা: অন্যান্য দেশ হইতেও যব রপ্তানী করে, কারণ যবের প্রভূত ব্যবহার ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছে।

বিশ্লেষণ

যব বহুকাল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। রাসায়নিক বিশ্লষণে দেখা যায়, যবে সহজপাচ্যরূপে বহুল পুষ্টিকর পদার্থ রহিয়াছে। ইহাতে শতকরা শ্বেতসার ৬০-৬৫, জলীয় অংশ ১২-১৮, আমিষাংশ ৮-১৫, সেলুলোস্ ও পেণ্টোস্ (Cellulose & Pentose) ৭, স্নেহ জাতীয় পদার্থ ২-৫ এবং খনিজ পদার্থ ২·৫ আছে। সুতরাং ভোজ্যরূপে যবের আদর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। লোকে ছাতু করিয়া যবের ধ্বংস করে।

যবের বর্ত্তমান ব্যবহার

আঁট বাধার মত বস্তু কম থাকায় রুটী বানাইবার পক্ষে যব উপযুক্ত নয়; কিন্তু গমের আটার সহিত আধাআধিভাবে মিলাইয়া লইলে খুব সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং

মোলায়েম রুটী হইয়া থাকে। কড়া করিয়া সেঁকিয়া লইলে এবং গরম অবস্থায় লবণ সহযোগে ভোজন করিতে পারিলে বিলাতী বিস্কুটকে হার মানাইতে পারে। কৌটা ভরা "বার্লি" (বিজ্ঞাপনের কৃপায় সকলেরই গোচরে আনীত) রোগীর ঘরে সমাদৃত। সাধারণতঃ কৌটায় গুঁড়া অবস্থায় দেখা যায়, আবার কখনও কখনও গোলাকার অবস্থায় বোতলে বা কৌটায় পাওয়া যায়। সেগুলি আস্ত যবের খোসা ছাড়াইয়া যন্ত্রের মধ্যে মাজিয়া এবং চাপ দিয়া আকৃতির সামান্য বদল করিয়া দেওয়া হয়। ইহাই পার্ল বার্লি (Pearl Barley) এবং চূর্ণীকৃত বালি অপেক্ষা ইহা পুষ্টিকর।

"বার্লি"

এখন বার্লির আদর বিয়ার (Beer) নামক মদ্য এবং মাদক বা যবসুরা প্রস্তুত করিতে। ঐ জাতীয় নানারকম মদ বিলাতী নামে চলিতেছে, যেমন "lager beer" মৃদু মাদক, "ale" অর্থাৎ হপ্ নামক লতার নির্য্যাস দ্বারা সুগন্ধীকৃত মদ্য। সুরাসার ও সির্কা প্রভৃতিতেও ঐ যবসুরা লাগে। ইহার মূলের বস্তু, মল্ট (malt) বা অঙ্কুরোদ্গত যব। ভিজা যব ১০ হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত ১০ হইতে ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে রাখিবার পর অঙ্কুরিত হইলে (malt) তাহাকে ধীরে ধীরে শুষ্ক করা হয় এবং এক সময় তাপ দ্বারা অঙ্কুরের বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই অঙ্কুরোদ্গমের কালে শস্যের মধ্যে diastase (ডায়াস্টেস্) নামক রসের উদ্ভব হয় এবং এই রস তণ্ডুলের সমস্ত শ্বেতসারকে মল্টোস্ (maltose) শর্করা ও ডেক্স্ট্রিন (dextrine) এতে পরিণত করে। সুরাসার প্রস্তুত করিবার জন্য মল্টোস্ শর্করা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। Diastase জলে দ্রবণীয় এবং ৪০–৬০ সেন্টিগ্রেড তাপে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সে কারণে মল্টে পরিণত যব, গুঁড়া

"মল্ট"

করিয়া গরম জলে (mashing) ফেলিয়া diastaseকে শ্বেতসারের উপর ক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। পরে ঐ জল (wort) ফুটাইয়া diastaseকে নষ্ট করিয়া দিয়া yeast বা সুরাবীজ দেওয়া হয়।

"বিয়ার"

এতদবস্থায় থাকিবার পর সমস্ত বস্তুই বিয়ার (beer) নামক মদ্যে পরিণত হয়। যুক্তরাজ্য, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক কারখানায় কোটী টাকার উপর মূলধন লইয়া কয়েকটী কারবার আছে; (আর আমাদের দেশে ?)। বিয়ার প্রস্তুত ব্যতিরেকেও মল্টের দাম খুবই বেশী। বার্লির মল্ট কেবল যে নিজদেহস্থিত শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করে তাহা নহে; চাউল, ভুট্টা প্রভৃতি শ্বেতসারবহুল তণ্ডুলের মধ্যেও শর্করা সৃষ্টির জন্য এই মল্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুল এই মল্ট-যোগে শর্করায় পরিণত হইলে মাতাইবার বা গাঁজাইবার (fermen-tation) বিশেষ সুবিধা হয় এবং তাহা হইতে সাধারণ ব্যবহারের জন্য প্রচুর সুরাসার প্রস্তুত হয়। মল্ট পাওয়া গেলে তাহার পর নানা ব্যবহার আছে। মল্ট-যুক্ত বোতলে ভরা গুঁড়া দুধ (Malted milk) পৃথিবী ছাইয়া আছে। ভারতে প্রতি বৎসর ৭০।৭৫ লক্ষ টাকার "বিলাতী দুধ" আসে, তাহার মধ্যে "মল্টেড মিল্কের" পরিমাণ খুব বেশী। আমাদের ঐরূপ দুগ্ধের উল্লেখযোগ্য কোনও কারখানা নাই। Malt

মল্ট-সার

Extract বা "মল্ট-সার" বার্লি মল্টের রূপান্তর। মিষ্ট স্বাদ, ঘোর হরিদ্রা রঙ এবং চটচটে এক বস্তু মল্ট-সার নামে চলিতেছে। মল্টের সহিত গরম জল মিলাইয়া তাহাকে প্রবল চাপ দিয়া রাখা হয়; পরে চুয়াইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাপ দ্বারা ঐ জল ঘনসারে পরিণত করা হয়। এই বস্তুতেও শ্বেতসারকে ডেক্সট্রিন ও মল্টোস্-শর্করায় পরিণত করিবার

ক্ষমতা থাকায় পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়। কড্ মাছের তেল, দুগ্ধ বা অন্যান্য পথ্যের সহিত মিলাইয়া খাওয়ার রীতি বিশেষ প্রচলিত। মল্ট-সিরকাতেও বার্লি মল্ট প্রয়োজন। ঔষধার্থে মল্ট-সার পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে।

পশুর খাদ্য হিসাবে যব, অঙ্কুরোদ্গত যব বা মল্ট এবং মদ্যপ্রস্তুতের পর পাত্রের তলস্থিত অব্যবহার্য্য বস্তু অতিশয় মূল্যবান। শুষ্ক গাছগুলি জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দেশে যে পরিমাণ যব হয়, তাহাতে বর্ত্তমান হিসাবে ভারতের স্থান তৃতীয়; কিন্তু আমাদের দেশে কি একটীও বিয়ার বা মল্টের কারখানা আছে? কবে আমাদের এ দিকে চক্ষু খুলিবে তাহা বলিতে পারা যায় না। দেশে যে পরিমাণ শুষ্ক ও তপ্ত বাতাস বহে, তাহাতে আমাদের দেশে মল্ট শুকাইয়া লওয়ার সুবিধা হয়ত বা বেশী। আর মল্ট্ একবার তৈয়ারী হইলে এবং ভাল করিয়া রাখিতে পারিলে বৎসরাধিক কাল কার্য্যকরী থাকে।

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশ হিসাবে চাষ ও ফলন

(১৯৩৬—৩৭)

মোট জমি—৬৪,৬২,০০০ একর

মোট ফলন—২৩,১৩,০০০ টন

প্রদেশ	জমির পরিমাণ হাজার একর	শতকরা অংশ	ফসলের পরিমাণ হাজার টন	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	৯৫	১·৩	৩১	১·৩
বিহার	১২,৭২	১৯·৬	৪,৩২	১৮·৬

প্রদেশ	জমির পরিমাণ হাজার একর	শতকরা অংশ	ফসলের পরিমাণ হাজার টন	শতকরা অংশ
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,৭৪	২'৬	৫৩	২'২
যুক্তপ্রদেশ	৪০,৬০	৬২'৮	১৫,৫৮	৬৭'৩
পঞ্চনদ	৭,৩৮	১১'৪	২,০৬	৮'৮

(খ)

পৃথিবীতে যব চাষ

মোট—৪,১৩,৮২,০০০ টন

দেশ	পরিমাণ হাজার টন	প্রতি একরে ফলন পাউণ্ড
রুষ গণতন্ত্র	৮০,৮০	৮৩৫
চীন	৮০,৫৫	১০৬৪
আমেরিকা	৩১,৭৮	৮৭৮
জার্ম্মাণী	৩৩,৬৫	১৮৫৬
ভারতবর্ষ	২৩,১৩	৮৭৯
তুরস্ক	২২,৮০	১,১৩২
স্পেন	১৬,৯২	৮৩৩
রুমানিয়া	১৫,৯৬	৯০১
কানাডা	১৫,৫০	৭৮৮
ফরাসী অধিকৃত মরক্কো	১৫,১৪	৮৫৬
জাপান	১৪,৮৬	১,৭৮৫
পোলণ্ড	১৩,৮৭	১০৬৮
চেকোশ্লোভাকিয়া	১০,০৯	১,৪২৮

(গ)

আমদানীর পরিমাণ

সাল	টাকা
১৯৩৫—৩৬	৩,৮০,৩৮৯
১৯৩৬—৩৭	২,৭৪,৮৭৮
১৯৩৭—৩৮	২,৭২,৮৪৮

রপ্তানীর পরিমাণ

সাল	টন	টাকা
১৯৩৫—৩৬	৩,৫১৬	২,১২,৬২৮
১৯৩৬—৩৭	৯,৭৭৮	৬,৪০,৯২৬
১৯৩৭—৩৮	৩৫,১৪৪	২৮,৫১,৮৬৫

(ঘ)

ক্রেতা—নাম ও অংশ

১৯৩৭—৩৮

দেশ	টন	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	২৩,১৬৯	১৮,৬২,৩৯৩	৬৬
অপরাপর	১১,৯৭৫	৯,৮৯,৪৭১	৩৪

(ঙ)

রপ্তানীর অংশ—প্রদেশ হিসাবে

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
সিন্ধু	:৪,৬৬	৫১.৪
বাঙ্গলা	১৩,৭১	৪৪.৫
বোম্বাই	১৫	৪.১

মকাই বা ভুট্টা (Maize)

ভুট্টা কথাটী বাঙ্গলাদেশে প্রায়ই "খোট্টার" সহিত মিলাইয়া দিয়া ইহার আসল রূপ ও ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করা হয় না। সাধারণ বাঙ্গালী মনে করে, রাস্তার ধারে গামলায় আগুন রাখিয়া আধা-সেঁকা আধা-পোড়া ভাবে যে পরিমাণ ভুট্টা বিক্রীত হয় এবং লোকে রুচি অনুযায়ী যে এক পয়সা বা দুই পয়সা কিনিয়া খায়, ইহাই বোধ হয় ভুট্টার প্রথম এবং শেষ ব্যবহার। মনে মনে ইহাও একটা ধারণা হয়ত আছে, "পশ্চিমারা" যখন প্রচুর খায় এবং তাহাদের স্বাস্থ্যও সাধারণ বাঙ্গালী অপেক্ষা ভাল, তখন ভুট্টা হয়ত পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু ভুট্টার আসল দাম এবং আদর কত, তাহা বাঙ্গালী ত জানেই না, যাহাদের দেশে প্রচুর ভুট্টা উৎপন্ন হয় এবং অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তাহারাও নিশ্চয়ই ইহার প্রকৃত ব্যবহার ধারণা করিতে পারে না। বাঙ্গালী, ধান-চাল বলিতেই অজ্ঞান, কিন্তু জগতের বিদ্বান, বুদ্ধিমান জাতি, যাহারা সকল পদার্থের, এমন কি অতি তুচ্ছ বস্তুরও প্রকৃত মূল্য জানে, তাহাদের নিকট মকাইয়ের আদর খুব বেশী।

মকাই বা মক্কাই নাম হইতে পণ্ডিতেরা মনে করেন ভুট্টা (মক্কা দেশীয় শস্য) মুসলমান আমলে ভারতে প্রথম আসে। ভারত আগমনের পর বাবর এখানে যে সকল পশু ও শস্যাদি দেখিতে পান, তাহার এক তালিকা লিপিবদ্ধ করেন (১৫২০-৯); তাহাতে ভুট্টার কোনও উল্লেখ না থাকাতে মনে হয় তখনও ভারতবর্ষে ভুট্টার চলন ছিল না। De Candolle অনেক তথ্য আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, ভুট্টা নিউ গ্রানাডা (দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া যুক্তরাজ্যের পুরাতন নাম) দেশে

খুব প্রচলিত ছিল এবং সেখান হইতে অন্যান্য দেশে নীত হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন আমেরিকা হইতে ভুট্টা ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল।

ভুট্টার ভারতে আগমন

প্রথমে জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণাগুণ বিষয় ঠিক করিতে না পারায় ভুট্টার চাষ তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। পরে প্রদেশ অনুসারে বীজ নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ভুট্টার চাষ ছড়াইয়া পড়ে। প্রয়োজন হিসাবে এখন সারা পৃথিবীতে ভুট্টার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে, তবে এখন কেবলমাত্র ভোজন ব্যতিরেকে যাহারা যত রাসায়নিক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহারা তত অধিক পরিমাণ ফসল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভুট্টা ভারতের সর্ব্বত্র জন্মিলেও পরিপুষ্ট শস্যের চাষ হিসাবে ইহার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। কাঁচা ভুট্টার ব্যবহার নিতান্ত কম নয়, সে কারণে ইহা নানাস্থানে চাষ হওয়া ব্যতিরেকেও লোকের উঠানে, ঘরের আনাচে-কানাচে দশ বিশটা ভুট্টা গাছ হইতে দেখা যায়। আসল ভুট্টার ক্ষেত হিসাবে

বিভিন্ন চাষ ও ফসল

ভারতের মধ্যভাগের সমতল ক্ষেত্র এবং তাহার সমস্ত উত্তর ভাগ, হিমালয়ের সানুদেশ এবং সাগর হইতে ন্যূনাধিক ৯,০০০ ফুট উপরের নদীর উপত্যকায় প্রচুর জন্মিয়া থাকে। গঙ্গার নিম্ন উপত্যকা ভাগে কাঁচা ভুট্টার অধিক পরিমাণ চাষ আবাদ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কাঁচা ভুট্টা এত লাভে এবং এত অধিক পরিমাণে বিক্রীত হয় যে চাষীরা বুদ্ধিপূর্ব্বক কাঁচা ব্যবহারের উপযোগী ভুট্টা নির্ব্বাচন করিয়া চাষ করিয়া থাকে। পুষ্ট ভুট্টা হিসাবে উহার দাম নিতান্ত কম। ভারতের চাষী মাঠের অভিজ্ঞতায় এমন ভুট্টার বীজ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা স্থানীয় প্রয়োজন হিসাবে দুই তিন মাসে পুষ্ট

হইয়া থাকে এবং তাহা পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে কখনই ছয় মাস লাগে না। তবে প্রধান চাষ মোটামুটি পাঁচ ছয় মাসের হিসাব লইয়া করা হয়। কোনও স্থানে ভুট্টা বৎসরে দুইবার আবাদ করিতেও দেখা যায়।

বাঙ্গলার চাষ

বাঙ্গলা দেশে মোটামুটী আষাঢ়-শ্রাবণে মাটী চষিয়া আন্দাজ পাঁচ পোয়া হইতে দেড় সের বীজ প্রতি বিঘায় ছড়াইয়া দেওয়া হয়। শ্রাবণের শেষ ও ভাদ্রের মাঝামাঝি সময়ে ভাল করিয়া নিড়াইয়া দেওয়া হইলে পর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উর্ব্বর জমিতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর পর্য্যন্ত চাষ করা হয়; সেই জমিতেই পরে সরিষা প্রভৃতি দেওয়া চলে।

ভুট্টার ব্যবহার কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীতে চাষের পরিমাণ হইতে কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে: দেখা যায়, মোট সাড়ে একুশ কোটী একর জমিতে নয় কোটী একচল্লিশ লক্ষ টন ভুট্টা জন্মে। পৃথিবীতে অন্যান্য নানারূপ তণ্ডুল চাষ হইয়া থাকে, তাহার উপর বাঙ্গালীর অনাদৃত ভুট্টা যে পরিমাণ জন্মিয়া থাকে, তাহা সাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে চাষের পরিমাণ

যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিবৎসরই হ্রাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানারূপ "ঈতি"র উপদ্রব আছে; কিন্তু দেশের প্রয়োজন হিসাবে এই চাষ যে বেশী হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রয়োজন থাকিলেই হয় না, ঠিক সেই চাষের উপযুক্ত জমি ও আবহাওয়া বর্ত্তমান থাকা চাই। আমেরিকার কলকারখানায় ভুট্টা হইতে ব্যবসায়ের নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং সেখানে আবহাওয়া অনুকূল হওয়ায় ভুট্টার চাষ হয় বেশী।

তাহার পর আর্জ্জেণ্টাইনা, চায়না, রুমানিয়া, ব্রেজিল, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালী, হাঙ্গেরী প্রভৃতির পশ্চাতে ভারতবর্ষের স্থান। অন্যান্য দেশেও ভুট্টা চাষ হইয়া থাকে; ইহার পরিমাণ ও শতকরা-অংশ পরিশিষ্টে (ক) দেওয়া হইল।

আমেরিকায় মোটামুটী খুব বেশী চাষ হইলেও, আমেরিকা অপেক্ষা অন্যান্য কয়েকটী দেশে জমির অনুপাতে ফলনও অনেক বেশী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গম চাষের জন্য যত বর্ষা ও বায়ুর তাপ দরকার, ভুট্টায় তাহা অপেক্ষা দুইটাই বেশী মাত্রায় প্রয়োজন। ভারতের কথা আর বিশেষ বলিবার নাই; যাহা ফলে তাহা লইয়াই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রতি স্বাধীন রাজ্যই, যাহারা কৃষির উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছে, এই সকল হিসাব বিশেষ করিয়া রাখে এবং যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকে; বর্ষা, সেচ, অজন্মা প্রভৃতি কারণে কোনও এক বৎসরে ফলনের তারতম্য হইতে পারে মাত্র।

চাষের আবহাওয়া

আমরা ভারতবর্ষের হিসাবে দেখিতে পাই ব্রিটিশ ভারত ও করদ-রাজ্যে মিলিয়া মোট ৬৩ লক্ষ ৯১ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার এবং করদ রাজ্যে ৬ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমি পড়ে; অর্থাৎ শতকরা ৯০ ভাগ ব্রিটিশ ভারতে আছে। করদরাজ্যে মাত্র হায়দ্রাবাদেই সমস্ত চাষ হয়, মহীশূরে সামান্য মাত্র পড়ে। ফসলের পরিমাণেও দেখা যায় ব্রিটিশ ভারতে ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টন এবং করদরাজ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার, মোট ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টন চাষ হইয়াছে; ফসলের বেলায় শতকরা ৯৫ ভাগ চাষ ব্রিটিশ ভারতে হইয়াছে। জমির ভাগ শতকরা ৯০ ও ফসলের হিসাব

ভারতের চাষ—জমি ও ফলন

শতকরা ৯৫ ভাগ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেই মনে হয়, হায়দ্রাবাদ অপেক্ষা ব্রিটিশ ভারতের চাষ ভালই হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের চাষেও দেখা যায় ১৯৩৫-৩৬ সালে ২১ লক্ষ ১৮ হাজার টন চাষ হইয়াছিল কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালে ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টন মাত্র চাষ হয়; সুতরাং এক বৎসরে সেখানে ২৮ হাজার টন ভুট্টা কম জন্মিয়াছে।

ব্রিটিশ ভারতে নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাষ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রদেশে জেলার চাষ

যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পঞ্চনদ প্রদেশ এবং করদরাজ্যের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, ভুট্টা চাষের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। পরিশিষ্ট (খ) হইতে জমির অংশ, ফলন প্রভৃতি সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে।

যুক্তপ্রদেশের মধ্যে গণ্ডা জেলার স্থান প্রথম। পরে বুলন্দসর, সীতাপুর, খেরী, মিরাট, জৌনপুর, গোরক্ষপুর, এটোয়া, ফরক্কাবাদ, সাহারাণপুর, কানপুর প্রভৃতি জেলার স্থান।

বিহারে মজঃফরপুর জেলার পরে মুঙ্গের, সারণ, সাঁওতাল পরগণা, চম্পারণ, ভাগলপুর প্রভৃতির স্থান।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে হাজারা ও পেশোয়ার এবং পঞ্চনদের মধ্যে কাঙ্গড়া এবং হোসিয়ারপুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট হইতে দেখা যায় যুক্তপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই-এর জমির উৎপাদিকা শক্তি ভারতের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী।

পৃথিবীতে যে এত ভুট্টা বা মকাই হয়, তাহার ব্যবহার ভোজনেই পর্য্যবসিত হয় না; যাহারা জানে তাহারা ভুট্টাকে নানা কাজে লাগাইয়া থাকে এবং জগতের হাটে নানা বেসাতি করিয়া কোটী কোটী টাকা দেশে আনে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ভুট্টার আমদানী বা রপ্তানী বিশেষ নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বহু ভুট্টা রপ্তানী হইত।

ভারতে যে আন্দাজ কুড়ি লক্ষ টন ভুট্টা হয়, তাহা মোটামুটী সাঁকিয়া খাওয়া হয় এবং গুঁড়া করিয়া ছাতু ও আটা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভুট্টার খই ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; ছাতু গবাদি পশুর খাদ্যে লাগে। পাতা ও ডাঁটা কখনও কখনও পশুকেও খাওয়ানো হইয়া থাকে। কিন্তু ভুট্টার ব্যবহার এখানেই শেষ নয়। ইংরাজি নামে

আধুনিক ব্যবহার

নানারূপ পথ্য বা ভোজ্যের প্রচলন হইয়াছে; আমাদের দেশে তাহা জানা নাই, সুতরাং তাহার বাঙ্গলা নামও নাই। গুঁড়া ভুট্টা নানা আকারে চলিতেছে যথা Maizena, Maizeka, Maizemeal ইত্যাদি। উহারই আর একরূপ আমেরিকায় Hominy ও Mush, মেক্সিকোতে Tortillas, ইটালীতে Polenta, রুমানিয়ায় Mamalinga প্রভৃতি নামে পরিচিত।

পথ্য

এই সকল খাদ্য প্রস্তুত করিতে ভুট্টার ছাতু যে আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম Maize-grits বা Mealie-rice। "Blancmange" ও Custard powder তৈয়ারী করিতে ভুট্টার গুঁড়া লাগে। বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক জগতে স্বল্পমূল্যের শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ভুট্টার দাম। ইহাতে শতকরা ৬৫ হইতে ৬৮ ভাগ শ্বেতসার পাওয়া যায়; সুতরাং এত সস্তার ফসলে যখন এত অধিক পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়, তখন তাহার সম্পূর্ণ ব্যবহার করা চাই। শ্বেতসারের

শ্বেতসার

যত রকম রূপ আছে এবং যত প্রকার ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে ভুট্টার শ্বেতসার মোটামুটী সেই সকল কাজে লাগে। উহা হইতে শর্করা এবং সেই শর্করা হইতে

গ্লুকোজ হইতেছে, সুরাসার ও মদ্য, মল্ট, মল্টোস্. ডেক্সট্রোস্ এবং অন্যান্য নানা প্রকার মুখরোচক পদার্থ হইতেছে। মোরব্বা প্রভৃতি ঘনসার করিতে এই শ্বেতসারের শর্করা কাজে লাগে। Baking powder, পুডিং অর্থাৎ "বিলাতী পিঠা"য়, ছড়ানো হইতেছে। বয়ন কার্য্যে বিশেষতঃ তুলাজাত পদার্থে ভুট্টার শ্বেতসারের বহুল প্রয়োজন। পাতলা, ঝাঁজরা কাপড় (যেমন lace, curtain) প্রভৃতি কাপড়ের পূর্ণ আকৃতি ও মাপ আনিবার জন্য, ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য এই শ্বেতসার ঘন করিয়া গুলিয়া গরম করা হয়; পরে কাপড় ধীরে ধীরে তাহার মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া লওয়া হয়। তাহাতে কাপড় শক্ত হয় এবং বাহিরে বিক্রয় করিবার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা শিশি বোতলে ভরা কাগজ প্রভৃতি জুড়িবার জন্য যে আঠা দেখিতে পাই, তাহা ঐ শ্বেতসার ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কাজের জন্য চাল ও গমের শ্বেতসার অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল জাতি ইহাতেই সন্তুষ্ট নহে। ধনরত্নের শেষ কণা যেখানে পড়িয়া আছে, তাহা উহারা খুঁটিয়া আনিবে। গ্লুকোজ, সুরাসার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার পর যে "রদ্দি" পরিত্যক্ত মাল পড়িয়া থাকে, তাহা হইতে রবার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছে।

যৌগিক রবার

ভুট্টা, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারপ্রধান অথচ দামে সস্তা ফলমূল হইতে কারখানায় যৌগিক রবার (Synthetic rubber) হইতেছে এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে স্বভাবজাত রবার অপেক্ষা ব্যবহারে ইহা কোন রকমেই নিকৃষ্ট নহে। আমাদের নিকট ইহা নিতান্ত নূতন ও অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে ভুট্টা আবার রূপান্তরিত হইয়া রবার হইতে পারে।

সুরাসার প্রস্তুতের পর পাত্রে পরিত্যক্ত ময়লাকে গবাদি পশুর পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

তৈল

ভুট্টায় শতকরা ৩৫ ভাগ তৈল আছে এবং ইহা নিষ্কাসিত হইয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে "Maize Oil" বা "Corn Oil" অর্থাৎ ভুট্টার তেল বা তণ্ডুলের তেল। যখন নিংড়াইলেই এমন বস্তু পাওয়া যায়, তখন তাহার উপযুক্ত ব্যবহার থাকা চাই। ভোজ্য তৈল হিসাবে—যেমন সালাড তেল (Salad oil), জ্বালানী রূপে ও ধাতব পদার্থের ঘর্ষণ রোধ করিবার জন্য উহা তৈলসিক্ত (lubricated) রাখিতে ইহার বহুল প্রচার আছে। শেষোক্ত কাজের জন্য খনিজ তৈল বা অন্য কোনও বাদাম তৈল বা অলিভ তৈল মিশ্রিত হইয়া থাকে। পরে খইল গুলির যথাযোগ্য ব্যবহার করা হয়।

প্রতি অংশের ব্যবহার

ফল ও ফলজাত তৈল পাইবার পর কেহই নিশ্চিন্ত নাই। ডাঁটা, পাতা এবং ফলের আবরণী পাতলা খোলাগুলি পশুর খাদ্যে লাগাইল; আর কাগজ প্রস্তুত করিতে ডাঁটা পাতা আনা হইল। পাতলা খোসাগুলি আবার নূতনতর কাজে আসিল। ঘোঁড়ার জিন প্রভৃতি ভর্ত্তি করিতে, সিগারেটের কাগজ করিতে এবং মাল চালানী কাজে মাল আঁট করিয়া বসাইতে পাতলা খোসাগুলি বিশেষ উপযোগী। এ সকল তাহারা ফেলিয়া দেয় না এবং বেশ দামে বিক্রয় করে।

বিস্ফোরক

ডাঁটাগুলির নূতন ব্যবহার আছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরক প্রস্তুত করিতে ইহার সহিত নাইট্রিক এসিড মিলাইয়া কাজে লাগানো হয়। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে এতদুদ্দেশ্যে ইহা তুলা হইতেও অনেকাংশে ভাল। আরও কয়েকটী

ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে এবং কতক পরিমাণ সফল হওয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ ভুট্টায় শ্বেতসার ৫৮ ভাগ, আমিষ জাতীয় পদার্থ ১০ ভাগ ও জলভাগ ১৩ থাকে। যে দিন বৈজ্ঞানিকে ভুট্টার আসল রূপ চিনিতে পারিল, সেইদিন হইতেই তাহারা বুঝিল এই অতি সাধারণ ভুট্টা মণিরত্নের আকর। খনি হইতে রত্ন তুলিতে তুলিতে শেষ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ধরিত্রীবক্ষে যাহা প্রতিবৎসর আসে যায়, তাহার কোনও ক্ষয় নাই। আমরা ভুট্টার যে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দিই, তাহা প্রকৃত পক্ষে তাহার মূল্যের হয়ত সিকি মাত্র; তাহার পর যাহা গুপ্ত থাকে, সে ধন অপরের, আমাদের তাহাতে কোনও দাবী নাই। বিস্ময়ে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া থাকা ছাড়া ভুট্টার জগতে আমাদের আর কোনও বিশেষ কাজ নাই।

বিশ্লেষণ

পরিশিষ্ট

(ক)

পৃথিবীর চাষ

(১৯৩৬-৩৭)

মোট—৯,৪০,৫০,০০০ টন

	হাজার টন	শতকরা অংশ	প্রতি একরে পাউণ্ড
আমেরিকা	৩,৩৩,৩২	৪০·৭	৯০৫
আর্জেন্টাইনা	৯৩,৪৬	৯·৯	১,৫৩৭
চায়না	৬৩,৫২	৬·৭	১,২৬৭
রুমানিয়া	৫৫,৫৬	৫·৯	৯৫১
ব্রেজিল	৫৩,৪৬	৫·৬	১,১৯৯

	হাজার টন	শতকরা অংশ	প্রতি একরে পাউণ্ড
যুগোশ্লাভিয়া	৫১,৩০	৫·৪	১,৪৯৮
ইটালী	৩০,১৪	৩·২	২,০১৪
হাঙ্গেরী	২৫,৯০	২·৭	২,০১৫
ভারতবর্ষ *	২৪,৮৮	২·৬	৮১৫
দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য	২৪,৩৮		১,০৮৬
মাঞ্চুরিয়া	২১,০০		১,০৪১
মেক্সিকো	১৬,৫৮		৪৯৩
মিসর	১৫,৭৯		২,২১৮
ইত্যাদি			

(খ)

ভারতের প্রদেশ হিসাবে জমি ও ফলন

(১৯৩৬-৩৭)

মোট জমি— ৬৩,৯১,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত— ৫৭,৩০,০০০ " ৮৯·৭%

করদ রাজ্য— ৬,৬০,০০০ " ১০·৩%

মোট ফলন— ১৯,৪৬,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত—১৮,৩৬,০০০ " ৯৪·৫%

করদ রাজ্য— ১,১০,০০০ " ৫·৫%

প্রদেশ	জমির পরিমাণ হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
যুক্তপ্রদেশ	১৯,৬৫	৩০·৭	৫,৩৪	২৭·৪

* আন্তর্জ্জাতিক মহাসভার হিসাবে এই অঙ্ক ধরা হইয়াছে।

প্রদেশ	জমির পরিমাণ হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
বিহার	১৬,৪২	২৫·৬	৪,৮২	২৪·৭
পঞ্চনদ	১০,৭৮	১৬·৮	৩,৯২	২০·১
উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	৪,৫৭	৭·১	২,১৪	১০·৯
বোম্বাই	১,৮৫	২·৮	৫৪	২·৭
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	১,৫৪	২·৪	৮২	৪·২
মদ্র	৮১	১·২	৩৪	১·৭
বাঙ্গলা	৭৩	১·১	২৪	১·২
করদ রাজ্য				
হায়দ্রাবাদ	৬,৫৯	১০·৩	১,১০	৫·৬

(গ)

পাঁচ বৎসর জমি ও ফলনের পরিমাণ

(ব্রহ্ম বাদে)

সাল	হাজার একর	হাজার টন
১৯৩২-৩৩	৬৭,১৪	২১,১০
১৯৩৩-৩৪	৬৫,৫৩	১৮,৬৯
১৯৩৪-৩৫	৬৬,৩৭	২২,৫২
১৯৩৫-৩৬	৬৬,১১	২২,৩২
১৯৩৬-৩৭	৬৩,৯১	১৯,৪৬

যোয়ার (Jowar)

জুয়ার বা যোয়ারের নাম বাঙ্গলা দেশে মোটেই চলিত নাই; ব্যবহার সম্বন্ধে নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায় যে বাঙ্গলায় যোয়ারের ব্যবহারই নাই। বাঙ্গালীর ছেলেকে যোয়ার দেখাইয়া দিতে বলিলে নিশ্চিত বিপদে ফেলা হইবে। কিন্তু ভারতের ভোজ্য তণ্ডুলের মধ্যে যোয়ারের স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ইহা অতি আদিমকাল হইতেই ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতে গমের পরেই যোয়ারের স্থান, এমন কি যবেরও উপরে।

ভারতে ইহার স্থান যেরূপই হউক, পৃথিবীতে অন্যান্য তণ্ডুলের ন্যায় যোয়ারের কোন স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হয় না।

ভারতে চাষের পরিমাণ

অখিল ভারতে মোট তিন কোটী ৫৬ লক্ষ ৮৯ হাজার একর জমিতে ৭০ লক্ষ ৯ হাজার টন ফসল হইয়া থাকে। করদরাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতে ফলনের অংশ নানারূপ ভাগ করা যাইতে পারে; পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চনদ, মহীশূর ও সিন্ধুপ্রদেশে বহুল পরিমাণে যোয়ারের চাষ হইয়া থাকে।

প্রদেশে জেলার চাষ

বোম্বাই প্রদেশে সোলাপুর, পুনা ও সাতারা জেলা: মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে যোৎমল, আকোলা, অমরাবতী, নাগপুর, নিমার জেলা; মদ্রে বেলারী, কইম্বাটুর, গুণ্টুর, অনন্তপুর ইত্যাদি; যুক্তপ্রদেশে ঝাঁন্সী, কানপুর, হামিরপুর, মীরাট, আগ্রা, ইত্যাদি জেলায় যোয়ারের চাষ বেশী মাত্রায় হয়। সোলাপুরের সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হয় না।

প্রধানতঃ যোয়ারের চাষ দুইটী—এক জাতি হেমন্তে, আর এক

জাতি বসন্তে পুষ্ট হইয়া থাকে। হেমন্তের বীজ বর্ষায় রোপিত হয় এবং ভারতে উহাই প্রধান চাষ। সাধারণতঃ রবি ফসলের বীজ দ্বারা বর্ষায় ভাল চাষ হয় না।

চাষের কাল

মোটামুটী বিঘা প্রতি দুই মণ আন্দাজ ফল পাওয়া গিয়া থাকে; কিন্তু বলাই বাহুল্য নানা কারণে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে।

বিকানীর ও আজমীর প্রদেশে অলিপুরা নামে এক প্রকার যোয়ার হইয়া থাকে; তাহা হইতে মিছ্‌রি প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় যোয়ার অন্য প্রদেশে চাষ করিলে তাহার মিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমানে বাজারে "বিকানীরের মিছরি" খুব প্রসিদ্ধ এবং কোনও কোনও চিকিৎসক, রোগে অন্য মিছরির পরিবর্ত্তে "বিকানীরের মিছরি" ব্যবহারের, ব্যবস্থা দেন; কিন্তু উহা যে যোয়ার হইতে প্রাপ্ত তাহা সঠিক বলা যায় না।

ব্যবহার—মিছরি

আমেরিকায় যোয়ার জাতীয় তণ্ডুল হইতে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। চোলাই করিয়া যে সুরা পাওয়া যায়, তাহা সমঝ্‌দারেরা বলেন, রম্ (rum) নামক মাদকের ন্যায় স্বাদযুক্ত।

মাদক

কাহারও কাহারও মতে যোয়ার চাউলের পর ভারতীয়দের প্রধান খাদ্য। সে কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; কারণ গম বহু পরিমাণ জন্মিলেও তাহার বেশ মোটা রকম রপ্তানী আছে। "যোয়ারী রুটী" কাব্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং গমের সহিত মিলাইয়াও ইহা বহুল ব্যবহৃত হয়। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে যোয়ারের সুনাম আছে।

রুটী

ভারতে যোয়ার গবাদি পশুর খাদ্যহিসাবে বিশেষ সমাদৃত। যে

সকল দেশে ধান চাষ হয় না বা কম হয় এবং খড় দুর্ম্মূল্য, সেখানে যোয়ার সকলকে রক্ষা করে। গাছ ভাল না জন্মিলে গবাদি পশুর খাদ্যাভাব ঘটে। কচি যোয়ার অনেক সময় বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, যোয়ারের ডাঁটা (কাণ্ড)র মূলভাগে সামান্য পরিমাণ প্রুসিক এ্যাসিড থাকায় এরূপ ঘটে। তবে সকল যোয়ারেই যে এরূপ হয়, তাহা নহে। কাঁচা অবস্থাতেই পশুকে যোয়ার খাইতে দেওয়া হয়; আবার গাদা করিয়া শুষ্ক অবস্থায় রাখিয়া ক্রমে ক্রমে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

পশুর খাদ্য

যোয়ার এবং বাজ্‌রা উভয়েরই কিছু আমদানী ও রপ্তানী আছে। ভারতের পণ্যের খাতায় তাহাদের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হয় না, যোয়ার ও বাজরার অঙ্ক একই সঙ্গে পাওয়া যায়; সুতরাং নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে প্রত্যেকের অংশ স্বতন্ত্র বুঝিবার উপায় নাই। পরিশিষ্ট (ক) ও (খ) দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্য

পরিশিষ্ট

(ক)

যোয়ার ও বাজরার রপ্তানী

সাল	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৮,৫৪৩	৮,৩৬,৩২৫
১৯৩৬-৩৭	৭,১১২	৭,৫৫,২১৬
১৯৩৭-৩৮	৪,১৯৮	৫,০৬,০৩২

(খ)

যোয়ার ও বাজরার আমদানী

সাল	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	২৩১	১৮,৫২৩
১৯৩৬-৩৭	১৮৫	৪৭,১০৬
১৯৩৭-৩৮	১,১৫৫	১,২৭,৮৫৫

(গ)

প্রদেশ হিসাবে জমি ও ফলন

মোট জমি—৩,৫৬,৮৯,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত— ২,২৬,২৪,০০০ একর ৬৩.১%

করদ রাজ্য— ১,৩০,৬৫,০০০ " ৩৬.৯%

মোট ফলন—৭০,০৯,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত— ৪৫,২১,০০০ টন ৬৪.৫%

করদ রাজ্য— ২৪,৮৮,০০০ " ৩৫.৫%

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	৬	—	—	—
বিহার	৭৩	.২	১৮	.২
বোম্বাই	৯,০৯৬	২৫.৪	১,৫১৬	২১.৬
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৪,৬৫৮	১৩.০	১,০১৫	১৪.৫
মদ্র	৫,১২১	১৪.৩	১,৩০২	১৭.২
পঞ্চনদ	৯২৮	২.৬	১২৩	১.৭

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
সিন্ধু	৪০২	১.১	—	—
যুক্তপ্রদেশ	২,১২২	৫.৯	৪২৬	৬.১
করদরাজ্য				
বোম্বাই	৩,১০৭	৮.৭	৭৬৩	১০.৮
হায়দ্রাবাদ	৯,০২৫	২৫.৯	১,৫৭১	২২.৪
মহীশূর	৬২৮	১.৭	১২৬	১.৭

বাজরা (Bajra)

খাদ্য তণ্ডুল হিসাবে বাজরার নামও বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা জোয়ার অপেক্ষাও অপরিচিত বস্তু। তাহা হইলেও

বাজরার চাষ

মদ্র, পঞ্চনদ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশেও বাজরার বহুল আবাদ হইয়া থাকে। ইহা দরিদ্রের বন্ধু এবং রুটী পিঠা বানাইয়া লোকে খাইয়া থাকে। যাহাদের পক্ষে চাউল গম মিলানো কঠিন, তাহারা বাজরার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। পাখীর খোরাক বা "দানা" হিসাবে ইহা বহু পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। বাজরাও গবাদি পশুর খাদ্যে ব্যবহৃত হয়; ইহার কাঁচা বা শুষ্ক গাছও জোয়ারের ন্যায় খাইতে দেওয়া হয়। বাজরা বর্ষার চাষ, যোয়ার অপেক্ষা কিছু পরে চাষ স্থরু হয় এবং তাহা অপেক্ষা কিছু আগে ফসল উঠানো হইয়া থাকে।

ভারতে মোট ১ কোটী ৫২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে ২৪ লক্ষ ৭ হাজার টন ফসল হয়, তন্মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে জমির শতকরা ৭৩.১

আর ফলের ৭৮·৩ ভাগ পড়ে। করদ রাজ্যে জমি পড়ে ২৬·৯%, আর ফসল ২১·৭%। পরিশিষ্ট (ক) হইতে সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে।

বিভিন্ন জেলার চাষ

মন্দ্রের মধ্যে সালেম, ত্রিচিনপল্লী, ভিজাগাপাটাম, রামনাদ জিলা; বোম্বায়ে আহম্মদনগর, বিজাপুর, দক্ষিণ খান্দেশ, নাসিক, পুণা জেলা; পঞ্চনদে হিসার, আটক, ফিরোজপুর, রোহতক, গিরগাঁও জেলা; যুক্তপ্রদেশে বুদাওন, মোরাদাবাদ, হর্দ্দি, কানপুর, ফতেপুর জেলা বাজরা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

ধান, গম, যব, জোয়ার ও বাজরা-ই ভারতের প্রধান তণ্ডুল। ইহারাই লোকের ক্ষুধা নাশ করিয়া, শরীর পুষ্টি করিয়া জীবনধারণের সহায়তা করে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে না। তাহার উপর ভোজ্য তণ্ডুলের মূল্য হ্রাস পাইয়া চাষীকে বিব্রত করিয়াছে। এই দুই বিষয়েই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মন দেওয়া দরকার। উপরন্তু এই সকল ফসল হইতে রসায়নশাস্ত্র যে ধনরত্নের সন্ধান দিয়াছে তাহারও কিছু সংগ্রহ করিবার সময় আসিয়াছে।

পরিশিষ্ট

(ক)

বাজরা—

প্রদেশ হিসাবে জমি ও ফলন

মোট জমি—১,৫২,৬৯,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত—১,১১,৭১,০০০ „ ৭৩·১%

করদরাজ্য— ৪০,৯৮,০০০ „ ২৬·৯%

মোট ফলন—২৪,০৭,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত—১৮,৮৫,০০০ „ ৭৮·৩%

করদরাজ্য— ৫,৫২,০০০ „ ২১·৭%

প্রদেশ	জমি হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
বোম্বাই	২৩,১১	১৫·১	২,৭১	১১·২
মদ্র	২৭,৬৮	১৮·১	৭,০৯	২৯·৪
পঞ্চনদ	২৮,৫১	১৮·৭	৩,৬০	১৪·৯
যুক্তপ্রদেশ	২০,৪৬	১৩·৪	৩,৭২	১৫·৪
সিন্ধু	৮,০২	৫·২	৮৩	
করদরাজ্য				
হায়দ্রাবাদ	২১,৬২	১৪·২	১,২৭	৫·২
বোম্বাই	১৮,৬১	৬·১	৩,৮৭	১৬·০

যে সকল প্রদেশের নাম দেওয়া হয় নাই, এ সকল স্থানের জমি ও ফলনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নহে।

জই (Oats)

তণ্ডুলের মধ্যে যে জই বলিয়া কোনও এক পদার্থ আছে, তাহা অধিকাংশ বাঙ্গালীই জানে না; চক্ষে যে কতজন দেখিয়াছে, তাহাও বলা বড় কঠিন। বাঙ্গলাদেশে ইহার চাষ নাই বলিলেও চলে।

জই কবে এবং কোথায় প্রথম জন্মিয়াছে, তাহা এখন আর বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন এসিয়া মাইনর বা তাতার প্রদেশের কোনও অংশ ইহার আদিম জন্মস্থান। ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে চাষ আবাদ হইতে থাকে, ইহাই অনুমান করা হয়।

ইতিহাস

প্রধানতঃ ইহা পঞ্চনদের মধ্যে হিসার ও দিল্লীতে ভাল করিয়া জন্মে। যুক্তপ্রদেশের মীরাট অঞ্চলেও প্রচুর ফলে। বোম্বাই প্রদেশের পুণা, আহম্মদনগর, সাতারা, আহম্মদাবাদ অঞ্চলেও কতক পরিমাণে ফসল হইলেও পঞ্চনদের সঙ্গে কোনওরূপে তুলনা করা যায় না।

জেলার চাষ

পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচুর চাষ হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে রুষগণতন্ত্রের স্থান সর্ব্বপ্রথম। আমেরিকা, জার্ম্মাণী, কানাডা ও ইউরোপের নানা দেশ ও রাজ্যে জই ফলিয়া থাকে। পৃথিবীর ফলনের মোট পরিমাণ আন্দাজ ছয় কোটী টন; তন্মধ্যে রুষে এক কোটী তিরাশী লক্ষ টন ফলে। জার্ম্মাণীতে পঞ্চান্ন লক্ষ, কানাডায় একচল্লিশ লক্ষ, পোলাণ্ডে ছাব্বিশ, ইংলণ্ডে কুড়ি, সুইডেনে সওয়া বারো ও চেকোশ্লোভাকে বারো লক্ষ টন জই ফলিয়া থাকে। অন্যান্য অনেক দেশে জই ফলে,

পৃথিবীর চাষ

কিন্তু তাহাদের পরিমাণ খুব বেশী নহে বলিয়া স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইল না।

চাষ

বর্ষার শেষের দিকে, ভাদ্রের শেষ বা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ ছড়াইয়া চাষ করা হয়। যব চাষের সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। সাড়ে তিন হইতে চার মাসে গাছ পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং সবুজ অবস্থাতেই কাটিয়া লওয়া হয়। ধান্য প্রভৃতি অন্য তণ্ডুলের মত গাছ একেবারে শুষ্ক হইতে দেওয়া হয় না। স্বল্প কাঁচা থাকিতে কাটিয়া লইলে "খড়" পশুখাদ্যের বিশেষ উপযোগী থাকে। তাহা ছাড়া বেশী শুষ্ক হইতে দিলে ফল একেবারে ঝরিয়া পড়ে।

ব্যবহার

গৃহপালিত পশুর খাদ্যরূপে জই চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা মানুষের খাইবার অনুপযুক্ত মনে করা হয়। Oat meal porridge বা জই-এর "পায়েস" অনেকদিন প্রচলন আছে কিন্তু ইহা খুব বেশী নহে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আজকাল কানাডার কোনও কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে বহু টাকা লইয়া যাইতেছে। বহু ঘরেই আজকাল কৌটায় ভরা জই বা ওট্স্ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঘোড়ার খোরাক বলিয়া ওট্স্ পরিচয় লাভ করিয়াছে। অনেক স্থানে জই-এর সহিত তণ্ডুল বা ছোলা মিলাইয়া খাদ্যের উপযোগী বা যথারীতি পুষ্টিকর করিয়া লওয়া হয়।

জই-এর খড় সবুজ অবস্থাতেই পশুদিগের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। গাছ কাঁচা থাকিতে থাকিতে দুই তিনবার কাটিয়া লইয়া গবাদি জন্তুকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহা ধান্যের খড় অপেক্ষা পুষ্টিকর বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

পণ্য হিসাবে জই-এর বিশেষ পরিচয় নাই; কারণ এই পণ্যের রপ্তানী বা আমদানীর কোনও স্থিরতা নাই।

বাণিজ্য

পরিমাণও বিশেষ বেশী নহে। সিংহল ও মরিসস্, ভারতীয় জই ক্রয় করিয়া থাকে। গত তিন বৎসরে রপ্তানীর হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১৮৯	১৭,২৩৬
১৯৩৬-৩৭	২৪০	২৫,৬৯০
১৯৩৭-৩৮	৮৯২	১,০১,২৩০

ছোলা (Gram)

কৃষিজাত ফসলের রপ্তানীর মধ্যে ছোলা, দ্বিদল ও অন্যান্য কলায়ের অংশও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

ব্রহ্মকে যখন ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয় নাই অর্থাৎ সরকারী ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাবে তণ্ডুলাদির রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় উনিশ লক্ষ টন বা সাড়ে পনেরো কোটী টাকা ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা প্রায় নয় লক্ষ টন বা সাড়ে নয় কোটী টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। এই হ্রাসের প্রধান কারণ ব্রহ্মদেশের অঙ্ক

রপ্তানীর হ্রাস

ভারতবর্ষের অঙ্ক হইতে ভিন্ন রাখা হইয়াছে; তাহাতে পূর্ব্ব বৎসরে যেখানে প্রায় বারো কোটী টাকা চাউলের রপ্তানী দেখানো ছিল এ বৎসর তাহা কেবল ভারতবর্ষের অঙ্ক, মাত্র প্রায় পউনে তিন কোটী টাকাতে (২,৬২ লক্ষ) দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য বস্তু ছোলা, দ্বিদল বা দাইলের রপ্তানীর মোট পরিমাণ কিছু কমিয়াছে; এক কোটী যোল লক্ষ টাকার স্থলে অষ্টনব্বই লক্ষ হইয়াছে।

এই রপ্তানীর মধ্যে ছোলার অংশ নিতান্ত কম নয়। প্রায় তেইশ লক্ষ টাকার ছোলা প্রতি বৎসর রপ্তানী হয়। রপ্তানীর মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী (৫৩.৪%) এক ফরাসীরা লইয়া থাকে। সিংহল, ষ্ট্রেট্‌স্ সেটলমেণ্টস্, এডেন প্রভৃতি দেশেও ছোলা রপ্তানী হইয়া থাকে। উহারা প্রত্যেকে মোট রপ্তানীর শতকরা প্রায় ১২ ভাগ লইয়া থাকে; পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

ছোলার ক্রেতা

সিন্ধু বন্দরকে বাদ দিলে ছোলা রপ্তানীর অধিকাংশই বাদ পড়িয়া যায়। কমবেশী শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ সিন্ধু হইতে রপ্তানী হয়। বোম্বাই ২৭ ভাগ, বাঙ্গলাও নামমাত্র ছোলা রপ্তানী করে। পঞ্চনদ প্রদেশের ছোলা অধিক মাত্রায় সিন্ধু বন্দর দিয়া রপ্তানী হয়; পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য।

বিক্রেতা

হরিদ্রাভ ও শ্বেত এই দুই প্রকার ছোলা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তপ্রদেশে, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে সাদা ছোলার আবাদ অধিক মাত্রায় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে কত পরিমাণ জমিতে ছোলা চাষ হয়, তাহা অনেকেরই হয়ত কোন ধারণাই নাই। মোটামুটি ১ কোটী ৪০ লক্ষ একর জমিতে ছোলার আবাদ হইয়া থাকে। প্রথম স্থান অধিকার করে যুক্তপ্রদেশ; তৎপরে পঞ্চনদের স্থান। যুক্তপ্রদেশে ভারতবর্ষের সমস্ত জমির শতকরা ৪০.২ ভাগ (৫৫ লক্ষ একর), পঞ্চনদে ২৬.৪ ভাগ (৩৬.২ লক্ষ একর), বিহার উড়িষ্যায় ১০.৬ ভাগ (১৪.৫ লক্ষ), মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে ৯ ভাগ

জমির পরিমাণ

(১২'৪ লক্ষ একর), বোম্বায়ে ৭'৪ ভাগ (১০'২ লক্ষ একর) পড়ে। বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও কিছু কিছু ছোলা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

যুক্তপ্রদেশে ছোলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় চাষ হয়। সকল জেলাতে যে সমান চাষ হয় না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রদেশের মধ্যে হামিরপুরা তিন লক্ষ দশ হাজার একর জমিতে চাষ করিয়া প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। বুদাউন, সাহারাণপুর, কানপুর, সীতাপুর, ফতেপুর প্রভৃতি জেলার স্থান পরে পরে।

বিভিন্ন জেলায় চাষ

পঞ্চনদের হিসার জেলা ছোলা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। সাড়ে এগারো লক্ষ একর জমিতে আবাদ হইতে দেখা যায় অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশের হামিরপুরা জেলার তিনগুণেরও অধিক। ফিরোজপুর, আম্বালা, মুলতান প্রভৃতি জেলাতে ছোলা চাষ উল্লেখযোগ্য।

বিহারের মধ্যে সাহাবাদ, গয়া, পাটনা, মুঙ্গের ছোলা চাষের জন্য বিশেষ পরিচিত। প্রত্যেক স্থানেই আড়াই লক্ষ একরের উপর জমিতে চাষ হইয়া থাকে।

মধ্য প্রদেশের ও বিরারের মধ্যে হোসাঙ্গাবাদ (তিন লক্ষ একর), ছিন্দবারা ; বোম্বায়ে উত্তর সিন্ধু সীমান্ত জেলা, নাসিক, আহম্মদনগর ; বাঙ্গলায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পাবনা, প্রভৃতি জেলাতেও চাষ হয়। কিন্তু এক মুর্শিদাবাদ ব্যতীত কোন স্থানেই জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নহে।

মাদ্রাজের কর্ণৌল, আসামের কামরূপ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বান্নু, মাত্র এই কয় জেলায় কিছু কিছু ছোলা চাষ হইয়া থাকে।

খাদ্যরূপে ছোলার বহুল প্রচলন রহিয়াছে। কচি, কাঁচা, শুষ্ক,

ভিজানো, ভাজা, সিদ্ধ, গুঁড়া প্রভৃতি যত প্রকারে পারা যায়, ছোলা খাইবার :ব্যবস্থা আছে। ছোলার ডাল মুখরোচক ও পুষ্টিকর। ভিজানো ছোলার অঙ্কুর বা কলা, ছোলা ভিজানো জল, আদা-ছোলা-গুড় এ সকলের ব্যবহার সকলেরই জানা আছে। ছাতু করিয়া খাওয়ার রীতি স্থানে স্থানে খুবই প্রচলিত। মোট কথা, উপাদেয়, পুষ্টিকর, সুলভ ও সহজপ্রাপ্য বলিয়া ছোলার খুব আদর আছে। পশুখাদ্য বিশেষতঃ অশ্বের জন্য ছোলার ব্যবহার প্রচুর।

ব্যবহার—ভোজ্য

ছোলাগাছ হইতে একপ্রকার সির্‌কা (Vinegar) পাওয়া যায় ; ইহা পথ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ভিনিগার সংগ্রহ করিবার জন্য এক প্রকার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয়। শিশিরসিক্ত ছোলাগাছের উপর রাত্রে সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র বিছাইয়া দেওয়া হয় ; পরে তাহা সকালে তুলিয়া আনিয়া নিংড়াইয়া লোকে ঐ ভিনিগার সংগ্রহ করে। ছোলা স্বতন্ত্র করিয়া লইবার পর, কাঁচা গাছগুলি গোজাতি পশুকে খাইতে দেওয়া হয়।

সির্‌কা

ছোলা বিশেষ পুষ্টিকর ; ইহাতে আমিষাংশ খুবই বেশী আছে কিন্তু কিছু দুষ্পাচ্য বলিয়া ইহা লোকে সাবধানে ব্যবহার করে। শ্বেতসার ৬৭·৭ ভাগ আছে। বাকী,আমিষ ২২·৮ %, স্নেহ ৪·২ % এবং খনিজ (লবণ) ২·৫ % পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে ইহার আরও প্রচলন হওয়া দরকার। এখানে ছোলার নাম অনেকে সহ্য করতে পারেন না, হয়ত জীর্ণ করিবার শক্তি কম বলিয়া এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রতি গৃহস্থ সংসারে সকাল বেলা সকলেরই ছোলা-ভিজানো ও কিছু গুড় খাওয়া ভাল। ইহাতে ভাইটামিন ও আমিষাংশ আছে, অথচ দামে খুব সস্তা।

বিশ্লেষণ

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশ হিসাবে জমির পরিমাণ ও অংশ

মোট জমি—১,৩৭,৩৩,০০০

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ
যুক্তপ্রদেশ	৫৫,১০	৪০.২
পঞ্চনদ	৩৬,২০	২৬.৪
বিহার (উড়িষ্যা)	১৪,৫৭	১০.৬
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	১২,৩৮	৯.০
বোম্বাই	১০,২২	৭.৪
বাঙ্গলা	২,০৭	১.৫
ইত্যাদি—		

(খ)

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭—৩৮)

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ফ্রান্স	১৩,৩৩৫	১২,২৫	৫৩.৪
ষ্ট্রেট্স সেটলমেণ্টস্	২,৫০৬	২,৭৪	১২.৩
সিংহল	১,৭৫০	২,৭৩	১২.০
অন্যান্য	৪,১৫৮	৫,০৪	—

(গ)
রপ্তানীর অংশ—প্রদেশ হিসাবে

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
সিন্ধু	১৭,৩৮০	১৬,০৩	৭০
বোম্বাই	৩,৮০৩	৬,১৫	২৭
বাঙ্গলা	৩৯৩	৪২	—
মদ্র	১৭৩	১৭	—

দ্বিদল বা ডাল (Cereals)

ছোলা বাদেও কয়েক লক্ষ টাকার ডাল কড়াই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এ সকল বস্তু কি পরিমাণ জন্মায় তাহার হিসাব স্বতন্ত্র রাখা ত হয়ই না, একসঙ্গে সকল কড়াই মিলাইয়া আবাদী জমির যে হিসাব রাখা হয়, তাহাও কোনও প্রকারেই ঠিক নয়। মসুর, মটর, অড়হর, কলায়, মুগ, খেসারি, কুলথ প্রভৃতি নানা প্রকার ডাল ভারতবর্ষে জন্মে এবং সকলগুলি চাষের জমির মিলিত পরিমাণ তিন কোটী একরের উপর ; তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে সাড়ে সাতষট্টি লক্ষ একরের অধিক অর্থাৎ সমস্ত জমির শতকরা ২২·৩ অংশ পড়ে। পরে পবে মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশে ও বিরার, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও বাঙ্গলার স্থান ; পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

জাতির বিভিন্নতা

নৈসর্গিক কারণবশতঃ এই জমির পরিমাণের যে অনেক তারতম্য হয় তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্থূলভাবে ধরিতে গেলে প্রদেশ হিসাবে চাষের জমির বিশেষ পার্থক্য হয় না। যে রূপেই হউক যুক্তপ্রদেশ প্রধান স্থান অধিকার করে।

যুক্তপ্রদেশে সীতাপুর, গণ্ডা, মির্জ্জাপুর, ফয়জাবাদ এই কয় জিলার প্রত্যেকটিতে দুই লক্ষ একরের অধিক জমিতে ডাল কলাই চাষ হয়; গণ্ডা জিলাতে জমির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ একর। মাদ্রাজেও ডাল কলায়ের চাষ খুব বেশী পরিমাণে হয়, তন্মধ্যে কর্ণেলের স্থান প্রথম, সেখানে আবাদী জমির পরিমাণ সওয়া সাত লক্ষ একরের অধিক। অনন্তপুর ও সালেম এই দুইটী জেলায় পাঁচ লক্ষ একরের উপর এবং ভিজাগাপট্টম, গণ্টুর ও কইম্বাটুরের প্রত্যেক জিলায় চার লক্ষ একরের উপর আবাদী জমি আছে। মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে এক দ্রুগ জিলাতে আন্দাজ সাড়ে আট লক্ষ একর, রায়পুরে প্রায় আট লক্ষ, বিলাসপুরে প্রায় সাত লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়। ছিন্দবারা, হোসাঙ্গাবাদ ও মুণ্ডলা জেলাতেও অনেক কলাই ফলিয়া থাকে। বিহারে মুঙ্গের, গয়া এবং সাহাবাদের প্রত্যেকের অংশে চার লক্ষ একরের উপর জমি পড়ে। পরে চম্পারণ, পাটনা, সারণ, পালামৌ, ভাগলপুর জেলার স্থান। বোম্বায়ে আহম্মদনগর, নাসিক, সাতারা এবং বাঙ্গলায় পাবনার স্থান প্রথম। পরে ফরিদপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা নিতান্ত মন্দ নয়। রঙ্গপুর, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি সকল জিলাতেই প্রচুর কলাই চাষ হইয়া থাকে। আসামে শিবসাগর, কামরূপ প্রভৃতি জিলার নাম উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন জেলার চাষ

কেবল মসুর দালই ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে কমবেশ সাড়ে উনিশ হাজার টন, মূল্য চব্বিশ লক্ষ টাকা, রপ্তানী হইয়া যায়। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড লয় প্রায় নয় লক্ষ টাকার মাল বা শতকরা ৩৬·৬ ভাগ। সিংহল আমাদের আর এক খরিদ্দার; সেখানে সওয়া আট লক্ষ টাকা বা রপ্তানীর ৩৪·৬ % যায়।

দাইলের রপ্তানী

মরিসসে প্রায় দুই লক্ষ টাকার দাইল যায়। পরিশিষ্ট (খ) হইতে সকলের পরিমাণ ও অংশ পাওয়া যাইবে। ডাল কলাই-এর পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপর আমদানী আছে; পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মই প্রধান বিক্রেতা, অর্থাৎ ৪৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৬ লক্ষ টাকার মাল দেয়।

অন্যান্য নানাপ্রকার ডাল কড়াই যথা, অড়হর, বরবটী, অ্যাসপারাগস্ মুগ, কুলথি বা কুলত্থ প্রভৃতি রপ্তানী হয় ৫০ লক্ষ টাকার বা ৪৪ হাজার টন। এস্থানে আমাদের প্রধান ক্রেতা সিংহল; ১৬ লক্ষ টাকা বা মোটামুটি তিন ভাগের এক ভাগ (৩৩%) লইয়া থাকে। ইংলণ্ড (৬·৭৬ লক্ষ টাকা) ১৩·৫% লয়। ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্ ১১·২, দক্ষিণআফ্রিকা যুক্তরাজ্য (Union of S. Africa), মরিসস্ ইহারাও যথাক্রমে শতকরা ৭·৮ ও ৮·৪ অংশ লয়। বর্ত্তমানে প্রধানতঃ এই কয় দেশই আমাদের ক্রেতা। পরিশিষ্টে (গ) স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত দেখানো হইল।

সকল প্রকার দ্বিদল বা ডালই অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য এবং আমিষ অর্থাৎ মাছ ও মাংসের সহিত প্রায় সমগুণসম্পন্ন, কিন্তু ইহাতে woody fibre (বা আঁশ) বেশী থাকায় সকলে সহ্য করিতে পারে না। তাহা হইলেও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ডালের ব্যবহার খুবই প্রচলিত।

মসুর—সাধারণতঃ উচ্চ ভূমিতে শীতকালে এই সকল কলাই অধিক মত্রায় ফলিয়া থাকে, এবং প্রতি একরে আড়াই হইতে তিন মণ মসুর পাওয়া যায়। শিশিরে ভেজা মসুর গাছগুলি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। মসুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর; সে কারণেই বোধ হয় বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে বিধবার পক্ষে মসুর ভোজন নিষিদ্ধ। রোগান্তের পর মসুর সিদ্ধ ঝোল দিবার ব্যবস্থা আছে। মসুর চূর্ণ কোথাও কোথাও বার্লির সহিত মিশ্রিত ও সিদ্ধ করিয়া সামান্য লবণ সহযোগে দুর্ব্বলকে সবল করিবার উদ্দেশে খাইতে দেওয়া হয়। রেশম,

এণ্ডি প্রভৃতি কাপড় কাচিবার জন্য এই ডাল বাটিয়া জলের সহিত মিশানো হয় এবং সেই জলে ঐ কাপড় ভিজাইয়া কাচিয়া লওয়া হয়।

মসুরে আমিষাংশ ২৪, স্নেহ ২, শ্বেতসার ৫৮·২ আর লবণ জাতীয় বস্তু ৪·৫ ভাগ আছে। লেদার (Leather) এর বিশ্লেষণে স্থির হইয়াছে, মসুরে আছে জলীয় ভাগ ৮·০৩, তৈল ১·০৬, এ্যালবুনিয়ড (আমিষ পদার্থ) ২৩·০, দ্রবনীয় কার্ব্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার) ৬১·১৪, woody fibre (উদ্ভিজ্জ তন্তু) ২·৪২, দ্রবনীয় খনিজ পদার্থ ৩·৫৪, বালু বা সিলিকা ০·৮১, মোট নাইট্রোজেন ৩·৯৪ ; এ্যালবুনিয়ড নাইট্রোজেন ৩·৬৮।

মুগ—মুগ বাঙ্গালীর বড় প্রিয়। ইহা দুই প্রকারের, যথা,—কৃষ্ণ ও সোণা মুগ। ভাজিয়া লইলে তাহা হইতে আবার রান্না ভাল প্রস্তুত হয়। ইহা অপর সকল ডাল হইতে সহজপাচ্য বলিয়া রোগের পর পথ্যে ইহার "ঝোল" ব্যবহার করে। ঔষধ হিসাবে মুগকে "জ্বরঘ্ন" বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার সেরূপ কোনও গুণ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

ভারতবর্ষই মুগের আদি জন্মস্থান বলিয়া মনে করা হয়।

অড়হর—এই ডাল কিছু দুষ্পাচ্য বলিয়া সাধারণ বাঙ্গালী ব্যবহার করিতে চায় না। অনেকেই অম্লরোগগ্রস্ত, সুতরাং ভোজনে নিশ্চয়ই আপত্তি দেখা যাইবে।

ইহাতে আমিষাংশ ২০, স্নেহ ২·৭, শ্বেতসার ৬৩·১, খনিজ (লবণ) ৮·৫ এবং উদ্ভিজ্জতন্তু প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থ আছে। ঘৃত সংযোগে উপযুক্ত পাক করিতে পারিলে ইহা অতিশয় সুস্বাদু হয়। পশ্চিম দেশে রুটীর সহিত এই ডাল বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য ডাল কড়াই হইতে ইহার বৃক্ষ কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের। শাখাপ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষে অড়হর শুঁটী ধরে। মাঘী এবং চৈতালী, এই দুটী ফসল হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় শ্রাবণে রোপণ করিলে পৌষ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল পাওয়া যায়। অনাবৃষ্টি হইলেও এই গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

খেসারি—ইহার অপর নাম তেওড়া বা তেউঁড়ে কড়াই। শীতের ধান উঠিয়া যাইবার কিছু পূর্ব্বেই মাঠে এই কলাই ফেলে এবং ফল ধরিবার পর হইতেই পল্লীবালকদের হাতে এই গাছের গোছা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে "মাঠের" রাস্তার পথিকদের সঙ্গী বলিলেও চলে। কচি অবস্থায় ইহা বেশ মিষ্টস্বাদযুক্ত।

ইহা অপেক্ষাকৃত সুলভ বলিয়া অন্যান্য দাইল অপেক্ষা ইহার ব্যবহার বেশী। ইহাতে আমিষাংশ ২৮ ভাগ এবং শ্বেতসার ৫৬ ভাগ আছে। সাধারণতঃ ইহা অধিক মাত্রায় দুষ্পাচ্য।

মটর—আমরা যে কড়াইশুঁটী এত পছন্দ করি, শুষ্ক হইয়া গেলে তাহাই আমাদের মটর কলায়ে পরিণত হয়। বাঙ্গলাদেশে ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে এবং কাঁচা অবস্থাতেই প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর দাইল অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য বলিয়া ইহা হিন্দুর হবিষ্যাদিতে ব্যবহারের রীতি আছে। রন্ধন করা মটর দাইল ঠাণ্ডা হইলে ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরের মত দাঁড়ায়। শীতের প্রারম্ভে ফসল দিলেও লোকে আজকাল প্রায় সারা বৎসরই কড়াইশুঁটী চাষের চেষ্টা করিতেছে।

কলায়—ইহার সাধারণ নাম মাষকলাই ; ইহা হরিদ্বর্ণ এবং অপর এক জাতির নাম কালিকলাই। রন্ধনে ইহা অত্যন্ত হড়হড়ে হয় বলিয়া অনেকে ইহা পছন্দ করেন না ; কিন্তু কয়েকটী জেলার লোকের ইহা

অত্যন্ত প্রিয়বস্তু। ইহাও দুষ্পাচ্য হইলেও পুষ্টিকর। অনেক স্থানে বিধবাদের কলাই ব্যবহার নিষিদ্ধ।

নানা সময়ে কলায়ের চাষ হইয়া থাকে তবে মোটামুটী পৌষ ও কার্ত্তিক মাসে ফসল দেয়।

এতদ্ব্যতিরেকে কুলত্থ বা কুলথি, উর্দ্দ্ ও ব্রীহি, ভূঙ্গা, গম্হার বা গভার, বরবটী, সিম প্রভৃতি নানা দাইল কলায় হইয়া থাকে ও তাহার রপ্তানীও আছে।

পরিশিষ্ট

(ক)

বিভিন্ন প্রদেশে জমির পরিমাণ ও অংশ

মোট জমি—৩,০৩,০০,০০০ একর

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ
যুক্তপ্রদেশ	৬৭,৫০	২২·৩
মদ্র	৬৬,০০	২১·১
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৫৪,০০	১৭·৫
বিহার (উড়িষ্যা)	৪৬,৩০	১৫·০
বোম্বাই	৩১,২০	১০·৩
পঞ্চনদ	১৪,০০	৪·২
বাঙ্গলা	১১,০০	৩·৬

ইত্যাদি-

(খ)

দ্বিদল বা দাইলের ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মসূর—

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৮,৪৮২	৮.৭৫,১৩১	৩৬·৬
সিংহল	৬,৫৪৯	৮,২৮,৪৯৮	৩৪·৬
মরিসস্‌	১,২১৬	১,৯১,০৭৮	৮·০
অন্যান্য	৩,১৬২	৪,৯৬,৪০০	
মোট—	১৯,৪০৬	২৩,৯১,১০৭	

(গ)

বিবিধ দ্বিদল,—ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
সিংহল	১৫,২২৪	১৬,৪৭,০৬০	৩৩·০
ব্রিটেন	৭,৮২৪	৬,৭৫,৮২০	১৩·৫
ষ্ট্রেটস্‌ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্‌	৪,২০৩	৬,৫৮,৮৪০	১১·২
মরিসস	৪,১৪৭	৪,১৯,৩৪১	৮·৪
দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য	১,৮৫৩	২,৮৭,৫৭৯	৭·৮
মালয়	৯৮৭	১,০৪,৪০২	২·০
অন্যান্য	৯,৫১৮	১২,৯৪,৫৩৭	
মোট—	৪৩,৭৫৬	৪৯,৮৮,৪৭৯	

(ঘ)

আমদানীর পরিমাণ ও মূল্য

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	টাকা
দ্বিদল বা ডাল কলাই	৪৫,৯৩২	৪৬,৩৪,৫৬৫
শুঁটী—দানা	১০,৯২৪	৯,৬৯,০৫৩

শুঁটীদানার মধ্যে নানাপ্রকার কড়াই পড়ে, যথা—বটবটীর দানা (Cow pea), সিম, মাখন সিম (Pantagonian bean) এবং অন্যান্য ইংরাজি নামধেয় দানা, যথা—Asparagus, Cluster bean, Kidney bean, Lima or Duffin bean (বন বরবটী), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২

তৈলবীজ

ও বিবিধ তৈল

পৃথিবীর মধ্যে তৈলবীজের চাষে ভারতের স্থান সর্ব্বপ্রধান বলা যাইতে পারে। সাধারণ জ্ঞান হইতে পণ্ডিতেরা চীনকে প্রথম স্থান দিয়া থাকেন, কিন্তু সেখানে নির্ভরযোগ্য কোনও হিসাব না থাকাতে অনেক সময় এবং অনেক বিষয়ে জগতের হিসাবে চীনের ফসলকে বাদ দেওয়া হয়। ভারতের জলহাওয়া তৈলবীজ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে তৈলবীজ একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে; ইহা ভারতের মোট রপ্তানী পণ্যের শতকরা আট ভাগ,

রপ্তানী

ওজনে সাড়ে নয় লক্ষ টন এবং আনুমানিক মূল্য সওয়া চৌদ্দ কোটী টাকা; কোনও কোনও বৎসরে তাহা কুড়ি কোটী টাকা পর্য্যন্ত পৌছে। এই চৌদ্দ কোটী টাকা মূল্যের বীজের রপ্তানীর মধ্যে চীনাবাদাম ও তিসিই প্রধান। এই দুইটীকে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহার পরিমাণ খুব বেশী নহে, অর্থাৎ এই দুই বীজে আন্দাজ বারো কোটী টাকাতে দাঁড়ায়।

এই রপ্তানী বাণিজ্যের প্রথম স্থান মদ্রের; সেখান হইতে

বিক্রেতা

অর্দ্ধেকেরও উপর মাল রপ্তানী হইয়া থাকে। অবশ্য চীনাবাদাম ছাড়িয়া দিলে মদ্র অনেক পিছাইয়া পড়ে। মদ্রের পর বোম্বাই, বাঙ্গলা ও সিন্ধুর স্থান।

বীজ ছাড়া নিষ্কাসিত তৈল এবং প্রচুর খইল রপ্তানী হয়। সকল প্রকার তৈল মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালন বা এক কোটী টাকায় দাঁড়ায় এবং খইলের পরিমাণ সাড়ে তিন লক্ষ টন, মূল্য প্রায় আড়াই কোটী টাকা।

তৈল রপ্তানী

ভারতে তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈলের আমদানীর পরিমাণ উপেক্ষণীয় নহে, তবে তাহার মধ্যে নারিকেল তৈল এবং শাঁসই প্রধান। সকল প্রকার তৈল আসে প্রায় এক কোটী টাকার (সাড়ে আটাত্তর লক্ষ গ্যালন) এবং তৈল বীজের পরিমাণ সাড়ে আটান্ন হাজার টন বা এক কোটী টাকার মাল।

আমদানী

তৈলের নানারূপ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে এবং কোনও বিশেষ বিশেষ তৈল হইতে আবার নানারূপ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রধানতঃ পরিপুষ্টির জন্য, জ্বালানী রূপে, সাবান, বাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, ধাতব পদার্থের ঘর্ষণ রোধ করিতে, বস্ত্রাদিতে রঙ ধরাইতে এবং ঔষধার্থে তৈলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। পশু খাদ্য এবং সারের জন্য খইলের প্রয়োজন।

তৈলের সাধারণ ব্যবহার

এই তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাসন করিবার পূর্ব্বেই আমরা রপ্তানী করিয়া দিই; তাহাতে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়। তাহা ছাড়া আমরা তৈল হইতে অন্য বিশেষ কোনও দ্রব্যাদি প্রস্তুত করি না; ইহাতে আমাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। তৈল বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ যথার্থ বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িলে দেশে নানাপ্রকার শিল্প প্রসার সম্ভব হইবে এবং তাহাতে বহু বেকারের অন্নসংস্থান হইবে।

চীনাবাদাম (Groundnuts)

ভারত হইতে দশ বারো কোটী টাকা দামের যে বস্তু বাহির হইয়া যায়, তাহা নিতান্ত তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা করিবার মত নহে। কিন্তু আমরা আত্মভোলা জাতি—আমাদের সে দিকে কোনও খেয়াল নাই। যদি ভাগ্যক্রমে বেশ ফেলিয়া গেল এবং বিদেশী কিনিতে আরম্ভ করিল তবেই আমরা বাঁচিয়া গেলাম! চীনাবাদাম আমাদের সেই প্রকার এক বস্তু। আহারে অতি সুস্বাদু, সস্তার ভোজ্যের মধ্যে অতিশয় পুষ্টিকর। বাঙ্গলায় ইহার প্রচুর চলন—রাস্তার ধারে, খেলার মাঠে, পল্লীর হাটে, উৎসবে, মেলায়—যেখানে বহু লোকে আসিয়া জমায়েৎ হয়, সেখানে ভাজা খাইয়া লোকে মুখের স্বাদ রক্ষা করে এবং নির্ব্বিবাদে চীনাবাদাম চর্ব্বণে কালক্ষেপ করে। এই শেষোক্ত কারণে রেল বা ষ্টীমার যাত্রীর

দৈনন্দিন ব্যবহার

ইহা মহাবন্ধু। যখন যান ছাড়িতে ঘণ্টাকয়েক বাকী থাকে, আর হাতে কোনও কাজ থাকে না, তখন লোকে আলস্যে কালহরণের জন্য চীনাবাদামের শরণাপন্ন হয়। পড়ুয়াদের "চানাচুর" নানা ছড়ায় প্রশংসিত হইয়াছে। আর এক মুখরোচক বস্তু "নকলদানা", চিনির রসে ফেলা চীনাবাদাম ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। কিন্তু ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। বালক ও অজীর্ণগ্রস্তের লালসার বস্তু এবং "দশন-বিহীনের" ক্ষোভ উৎপাদনকারী চীনাবাদাম লোকে কাঁচা বেশী খায় না; বাঙ্গালীর "পেটে" তাহা হজম হওয়া শক্ত। পুষ্টিকর বলিয়া সুনাম আছে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ সে সত্য প্রতিপন্ন করে। যাঁহারা সয়াবীনের গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ, তাঁহারা চীনাবাদামকে যোগ্যস্থান দিলে, বেচারার প্রতি সুবিচারই করা হইবে।

এই চীনাবাদামের দাম যাহাই হউক, ইহার আবির্ভাবের ইতিহাস

পুরাতন নয় এবং সে কারণে দীর্ঘও নয়। হয়ত চীন দেশ হইতে বাঙ্গলায় আসার দরুণ ইহার নাম চীনাবাদাম। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত নাম "মানিলা কড়াই",—হয়ত বা ব্রেজিল হইতে ইহা পশ্চিম ভারতে আসিয়াছে। ১৮০০ সালে "মহীশূর ভ্রমণ" নামে বুকানন-হ্যামিলটানের পুস্তকে ভারতে চীনা-বাদামের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আন্দাজ এক হাজার বিঘা চাষের হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৭৭-৮ সালে চীনাবাদাম ভারত হইতে রপ্তানী-যোগ্য ফল বলিয়া বিশেষ উল্লেখ আছে। ১৮৭১ সালে ভারতে ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে চাষ হয় এবং ১,২৭৪ টন ফল চালান যায়। সেই সময়েই সমঝ্‌দারে বুঝিতে পারে যে, চীনাবাদাম উত্তর কালে বিদেশীয়ের লোভনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। ইউরোপেও চীনাবাদাম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিশেষ পরিচয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার নিষ্কাসিত তৈল হইতে যে সকল বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহার জন্যই চীনাবাদাম এত অল্পকাল মধ্যে অদ্ভুত প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

চীনাবাদামকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কেবল কাঁচা বা ভাজা খাওয়ার জন্য এক প্রকার পাওয়া যায়, তাহাতে তৈলের অংশ কম থাকে। আর প্রচুর পরিমাণ তৈল ধারণ করে বলিয়া আর এক জাতির সমাদর বেশী। এখন লোকে শেষোক্ত প্রকারের চাষ বেশী পরিমাণে করিয়া থাকে, কারণ তৈলের ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তাই চীনাবাদামকে জগতে প্রসিদ্ধ করিয়াছে।

জাতির বিভিন্নতা

মাটী ও জলহাওয়ার গুণের উপর ফলনের পরিমাণ এবং ফলের গুণের তারতম্য নির্ভর করে। চীনাবাদামের প্রয়োজনীয়তা হেতু ইহার

উন্নতির নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে। মন্দ্রে ইহার বহুবিধ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যে বীজ লইয়া চাষ হয়, তাহাই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ভারতে নানাস্থানে চীনাবাদামের চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে মন্দ্র ও বোম্বায়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এক সময় ভারতের ফলের চাহিদা কমাইবার জন্য রব উঠে যে কেবল তৈলের পরিমাণে নয়, তৈলের গুণ হিসাবেও ভারতের "দানা" ভাল নয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়, খোসা পরিত্যক্ত দানার শতকরা ৪০ অংশ তৈল ভারতের ফলে আছে, কোনও স্থানে হয়ত সামান্য বেশী অর্থাৎ ৪৪ বা ৪৫। এ বিষয়ে মরিসসের দানাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন।

বীজের গুণাগুণ

মন্দ্রে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে দেখা যায়, দেশী হইতে যখন প্রতি একরে মাত্র ২৭১ পাউণ্ড ফলন হয়, তখন দক্ষিণ আফ্রিকার "সালম" জাতীয় বীজ হইতে ১৩৭৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ফলে। পণ্ডিচারীতে পরীক্ষার ফলে দেখা গেল সেখানে "সেনেগল" বীজই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। মোসাম্বিক হইতে প্রত্যাগত কোনও ভারতবাসী চীনাবাদামের যে বীজ লইয়া আসেন, তাহাই দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেই বীজই ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে চীনাবাদাম সরবরাহের প্রধান স্থান দান করিয়াছে।

নানা প্রদেশে নানা সময়ে চীনাবাদাম রোপণ করা হয়। প্রধানতঃ বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত মাটী চষিয়া বীজ ছড়াইয়া মাটী ঢাকিয়া দেওয়া হয়। কার্ত্তিক হইতে মাঘ নাগাদ ফসল পুষ্ট হইলে উপর হইতে গাছ তুলিয়া দিয়া মাটী খুঁড়িয়া ফসল তোলা হয়। বালিযুক্ত দো-আঁশ হাল্কা মাটী চাষের বিশেষ উপযোগী। জলনিকাশের সুব্যবস্থা থাকিলে এবং প্রচুর জলের সুবিধা থাকিলে ফল খুব ভাল

হয়। কাঠ পোড়া ছাই, পলি বা পুষ্করিণীর পাঁক, সামান্য পরিমাণ চূণ, গবাদি পশুর মলমূত্রাদি ছড়াইয়া জমিতে সার দিলে ফলনের খুব উন্নতি লক্ষিত হয়। একই জমিতে পর পর তিন বারের অধিক চাষ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। মধ্যে মধ্যে সার না দিতে পারিলে জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে।

চাষ ও সার

জমি ভাল করিয়া হাল দিয়া মাটী গুঁড়া করিয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ প্রতি একরে এক মণ হইতে এক মণ দশ সের বীজ ছড়ানো প্রয়োজন। গাছ বিশেষ ছাড়া ছাড়া হওয়া ভাল নয়। গাছে ফুল আসিবার মুখে, লোকে পা দিয়া আল্গা ভাবে মাড়াইয়া দেয়; তাহাতে গাছের ডালগুলি মাটীর সহিত সংযুক্ত হইবার সুযোগ পায়। চীনা-বাদামের ফুল মৃত্তিকার বাহিরে জন্মিয়া ফল আসিবার মুখে মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করে। গাছের মূলের কিছু উপরের ডালগুলিতে এই ফুল জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এক হিসাবে উপরের ডালগুলির ফলের দিক দিয়া বেশী প্রয়োজন নাই। যদি মাটী ভাল গুঁড়া হয় এবং সেচ প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ ভিজানো থাকে তবে ফসলের বিশেষ সুবিধা হয় ও ফল শীঘ্র মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পায়। মাটীর মধ্যে কড়াই জন্মায় বলিয়া ইহার অপর নাম "মাট্-কড়াই"।

ফলনের রীতি

ব্রহ্ম বাদে ভারতবর্ষে ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে চাষ হয়; ১৯৩৩-৪ সালেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চাষ হইয়াছিল অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ ৮৬ হাজার একর। ঐ সালে ফলনও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গিয়াছে অর্থাৎ ৩১ লক্ষ ৮৬ হাজার টন। গত বৎসরে ২৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টন ফলন পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই ও মদ্রে বেশী চাষ

ভারতের চাষ ও ফলন

হয়, আর করদরাজ্যের মধ্যে হায়দ্রাবাদ। প্রদেশ হিসাবে জমি ও ফসলের অঙ্কের জন্য পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

নৈসর্গিক কৃপার উপর নির্ভর করা জমিতে—যেখানে গড়ে প্রতি একরে ১৫০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ফলে, সেখানে সেচের (Irrigation) দ্বারা সিঞ্চিত জমিতে ২২৫০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ফলিতে দেখা গিয়াছে। বাঙ্গলায় উল্লেখযোগ্য চাষ হয় না; মাত্র মেদিনীপুরের কতকাংশে সামান্য পরিমাণ চাষ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ প্রতি একরে গড়ে ফলন—মাদ্রাজে ১০৬২ পাউণ্ড, বোম্বায়ে ৯২২, বোম্বায়ের করদরাজ্যসমূহে ৬৪১, মধ্যপ্রদেশে ৬৯২, হায়দ্রাবাদের ৭৪২, আর মহীশূরে ৪০৩ পাউণ্ড। সমগ্র ভারতের গড়ে ফলন ৮৬৪ পাউণ্ড; পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

মদ্রে প্রধান স্থান দক্ষিণ আর্কট (২,৯০,০০০ একর) অধিকার করে। পরে কর্ণৌল, অনন্তপুর, উত্তর আর্কট, গণ্টুর, বেলারী, কইম্বাটুর, ভিজাগাপট্টম—১,২৬,৩০৭ একর। অন্যান্য জেলায় আরও কম চাষ হয়।

বিভিন্ন জেলার চাষ

বোম্বায়ের প্রধান জেলা দক্ষিণ খান্দেশ (২,২৭,৮০০ একর), সাতারা, বিজাপুর, সোলাপুর, পশ্চিম খান্দেশ, বেলগাঁ, বরোচ ও পাঁচমহল—৪৫,৫০০ একর; তারপর অন্যান্য জেলার স্থান।

মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে উল্লেখযোগ্য জেলার মধ্যে বুল্‌দানা (৪৩,১৪২ একর), আকোলা, নিমার, অমরাবতী, যোৎমল (১০,০৬০ একর)।

গত কয়েক বৎসরে ভারতের ফলনের বিশেষ পার্থক্য গিয়াছে। বলাই বাহুল্য যে এই ফলনের সহিত জগতের মোট ফলনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে কারণ ভারতই জগতের প্রধান সরবরাহকারী। গত কয় বৎসরের ফলন পরিশিষ্টে (গ) দেখানো হইল।

চীনাবাদামের প্রয়োজনীয়তা বা বিবিধ ব্যবহার যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, পৃথিবীতে ইহার চাষও বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে মোট ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টন ফলিয়াছিল; তন্মধ্যে—ভারতবর্ষের স্থান প্রথম। পরে চীন, ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, নাইজিরিয়া, জাভা প্রভৃতি স্থানেও বহু চীনাবাদাম চাষ হইয়া থাকে; পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর চাষ

প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষ হইতে কয়েক কোটী টাকার মাটকড়াই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ কত তাহার কোনও ধারণা অনেকেরই নাই। ১৯২৮-২৯ সালে প্রায় ২০ কোটী টাকার মাল বাহিরে গিয়াছিল, তাহার পর কম হইতে সুরু করে। গত কয় বৎসরের হিসাব পরিশিষ্টে (ঙ) দেখানো হইল। ১৯৩৭-৩৮ সালে দানা, তৈল ও খইল মিলিয়া এগারো কোটী টাকার উপর গিয়াছে।

বহির্ব্বাণিজ্য

এই যে কয়েক কোটী টাকার মাল বাহিরে যায়, সাধারণের এই অনুসন্ধিৎসা হয় যে এত মাল লইল কে? যাহাদের প্রয়োজন বেশী তাহারাই লইবে, ইহা অবশ্য সদুত্তর। কিন্তু এই প্রয়োজন আর কিছুই নয়, ইহার খাদ্যাংশ নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া জগৎ হইতে টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনা; আর তাহা যাহারা ভাল পারে, তাহারাই বেশী লইয়াছে।

খরিদ্দার

ফ্রান্সে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যবসা আছে মার্জ্জারিণ (Margarine)এর। ইহা কি, পরে বলিতেছি; তাহা প্রস্তুত করিতে তৈল লাগে।

ইটালী, জার্ম্মাণী, ইংরাজ, ফরাসী, নেদারলণ্ডবাসী প্রভৃতি সকলেই চীনাবাদাম লয়; বিশেষ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট (চ) দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া খইল ও তৈলের ব্যবসা আছে। ইহাদের পরিমাণ

নিতান্ত কম নহে। খইল প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটী টাকার রপ্তানী হয় এবং ব্রহ্ম ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তৈলের রপ্তানীর অঙ্কও এখন নিতান্ত কম নহে; পরিশিষ্ট (চ) দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের মধ্যে মদ্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাষ হয় এবং রপ্তানীর অংশ তাহার ভাগেই বেশী পড়ে। পরিশিষ্টে (ছ) প্রদেশের বিভিন্ন অংশ দেখানো হইল।

চীনাবাদামের আদরের কারণ তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। খোলাশুদ্ধ বাদাম পরীক্ষা করিয়া শতকরা ৮·৬ ভাগ জল, তৈল ১১·৬, প্রোটীন বা আমিষজাতীয় পদার্থ ২৬·০, জীর্ণযোগ্য শ্বেতসার ২৬·২, কাষ্ঠাংশ ১৯·৩, আর খনিজ বস্তু ৮·৩। খোসা-ছোলা দানাতে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল আছে। তৈলের যাহারা ব্যবহার করে, তাহারা খোলা বাদ দিয়া লয়। মোটামুটী দানার ওজন দুই ভাগ এবং খোলার ওজন এক ভাগ ধরা হইয়া থাকে।

আধুনিক ব্যবহার

চীনাবাদাম লোকে কাঁচা খায়; ভাজিয়া খাওয়াই লোকে বেশী দেখিতে পায়; কিন্তু তৈলের ব্যবহারই প্রচুর। মার্জ্জারিণের বিশেষ ব্যবহার আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শূকর, গরুর মস্তিষ্ক ও চর্ব্বি হইতে মাখনের পরিবর্ত্তে যে বস্তু ইউরোপে বহুল পরিমাণে চলে, তাহাই মার্জ্জারিণ নামে পরিচিত। যুদ্ধের সময় মাখনের অভাব ঘটিলে মার্জ্জারিণ দ্বারা লোকে "দুধের সাধ ঘোলে" মিটাইয়াছে। আবার ঐ জাতীয় চর্ব্বি প্রভৃতির যতটা প্রয়োজন, ততখানি না পাওয়াতে নানারূপ স্নেহ পদার্থ মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে। চীনাবাদামের তৈল তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিয়াছে।

চীনাবাদাম হইতে লোকে সাধারণ অবস্থায় পিসিয়া তৈল বাহির

করে, আবার বেশী পরিমাণে পাইবার আশায় আন্দাজ ৩০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্ তাপ দিয়া কলে পিষিয়া থাকে। কখনও বা আরও অধিক উত্তাপ দিয়া পেষণ করা হয়। প্রথমোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত তৈল খাদ্য বস্তুতে চলে; সামান্য তাপে প্রাপ্ত তৈলও গ্রহণযোগ্য—কিন্তু তৃতীয় উপায়ে অর্থাৎ অত্যধিক তাপ দ্বারা নিষ্কাসিত তৈল ভোজ্য হিসাবে অচল। শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন তৈল পাইবার উদ্দেশ্যে লোকে উহাকে কয়লা বা "ফুলার্স আর্ত" (Fullers Earth) এর মধ্য দিয়া চুয়াইয়া লয়। পরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংমিশ্রণে উহাকে সর্ব্বপ্রকার গন্ধহীন করিয়া লওয়া হয়। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দুই প্রকার তৈলেই ক্ষার বস্তু মিশাইয়া উপযুক্ত গুণ বিশিষ্ট অথচ বহুকাল স্থায়ী করিয়া লওয়া হয়; ইহাতে তৈলের "চট্‌চটে" আঠাল অবস্থার শীঘ্র আবির্ভাব প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ভোজ্য বস্তুর সহিত মিলাইবার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট তৈলই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মার্জ্জারিণের জন্য উপরোক্ত তৈলের বহুল প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে যে "ঘৃতের" চলন, তাহার মধ্যে কতটা পরিমাণ 'বাদাম' তৈল আছে তাহার হিসাব ঠিক আমাদের জানা নাই। তবে ভারতে নিষ্কাসিত তৈল যে ঘৃতে কতকটা ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সালাড অয়েল (Salad Oil)এতে চীনাবাদামের তৈল প্রচুর লাগে। মাছ ধরিয়া বাক্সবন্দী করিতে ইহার প্রয়োজন সমধিক; এতদুদ্দেশ্যে তূলার দানার তৈলের চাহিদা বেশী। মার্শালিস্ (ফ্রান্স), হলাণ্ড এবং ইংলণ্ডে বড় বড় কারখানায় চীনাবাদামের তৈল নিষ্কাসিত হইয়া নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। সাবান তৈয়ারী করিতে, যন্ত্রাদি তৈল-নিষিক্ত রাখিয়া প্রতিঘর্ষণ রোধ করিতে, দীপ জ্বালাইতে চীনা-

তৈল নিষ্কাসন

ভেজাল

বাদামের তৈল বিশেষ উপযোগী। ধীর স্থির ভাবে জ্বলে, নির্ধূম শিখা হয়, সলিতা নষ্ট করে না এবং সহজে আঠাল হইয়া উঠে না—এইরূপ তৈলই আলো জ্বালাইতে বেশী লাগে এবং চীনাবাদামের তৈল এ সমস্ত গুণই সমন্বিত। অলিভ (olive), সরিষা, রেড়ী প্রভৃতি কয়েকটী তৈল, সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া তাহাদেরও আদর আছে।

নানা ব্যবহার

সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড্ (Sulphuric acid) যুক্ত বাদাম তৈল টার্কি রেড অয়েল (Turkey red Oil) নামে বাজারে প্রচলিত আছে। ইহাতে তৈলের অনুপাতে শতকরা পাঁচ হইতে আট ভাগ ঘনসার (শতকরা ৯৬ শক্তিযুক্ত) সালফিউরিক এ্যাসিড মিলাইয়া তৈয়ারী করা হয়। তন্তুজাত বস্তুতে রঙ ধরাইবার জন্য একান্ত প্রয়োজন বলিয়া ইহা বিশেষ দামে বিক্রীত হয় এবং তন্তু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতে এক প্রকার সাবান ('Textile Soap') এই তৈল ব্যতীত প্রস্তুত করা এক প্রকার

"টার্কি রেড অয়েল"

খইলের মধ্যেও শতকরা ৫ হইতে ৮ ভাগ তৈল, ৫ হইতে ৮ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ১ হইতে ১½ ভাগ ফস্ফোরিক এ্যাসিড থাকে; তাহাতে ইহা পশুর পক্ষে মহা পুষ্টিকর এবং উপাদেয় খাদ্য। জার্ম্মাণীতে নাকি ইহা হইতে মানুষের জন্য মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। দানার উপরের লাল খোসাগুলিতেও সামান্য পরিমাণ তৈল থাকে এবং উত্তাপ দিয়া তৈল নিষ্কসিত করিবার পূর্ব্বে এই লাল ছালগুলি মিশাইয়া দিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়; এই তৈল সাধারণতঃ গভীর হরিদ্রা বর্ণের হয় এবং সাবান প্রস্তুতে বেশী পরিমাণে লাগে।

খইল

কিছু সবুজ থাকিতে গাছগুলি উপর হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া গবাদি পশুকে খাইতে দেওয়া হয় এবং মহা আগ্রহে পশুরা ইহা ভোজন করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করে। গাছ শুষ্ক হইয়া গেলে তখন আর খাইতে চায় না।

পশুখাদ্য

আমাদের দেশে ইহার ব্যবহারের তালিকা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। কত রকম কাজে লাগে তাহা জানিয়াও আমরা চীনাবাদাম প্রকৃত পক্ষে অব্যবহৃত অবস্থায় পাঠাইয়া দিই। যদি আমাদের চাষীকে পূর্ব্ব হইতে কেহ জগতের প্রয়োজনের পরিমাণ জানাইয়া দিতে পারে বা তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আপনাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া বিদেশের বাজারে চাহিদা বুঝিয়া দর স্থির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে যে দরে চীনাবাদাম বিক্রীত হয়, তাহা অপেক্ষা যে অনেক বেশী দর পাওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর রসায়নশাস্ত্রবিদ যদি তাহার জ্ঞান দ্বারা বাণিজ্যের দ্রব্যসম্ভার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে বিদেশ হইতে বহু অর্থ দেশে আসিতে পারে।

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশহিসাবে চাষ ও ফলন

(১৯৩৬—৩৭)

মোট জমি— ৬৫,৫০,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত— ৩৫,১৬,০০০ একর ৬৯%

করদ রাজ্য— ২০,৩৪,০০০ „ ৩১%

মোট ফলন— ২৬,৬৬,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত— ২০,৬২,০০০ টন ৭৭·৪%

করদ রাজ্য— ৬,০৪,০০০ „ ২২·৬%

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
ব্রিটিশ ভারত—				
মদ্র	৩৪,৯৫	৫৩·৩	১৬,৫৭	৬২·১
বোম্বাই	৮,৭২	১৩·৩	৩,৫৯	১৩·৪
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	১,৪৯	২·২	৪৬	১·৭
করদ রাজ্য—				
হায়দ্রাবাদ	৯,৫৪	১৪·৫	৩,১৬	১০·৮
বোম্বাই	৮,৮০	১৩·৪	২,৫২	৯·৪
মহীশূর	২,০০	৩·০	৩৬	১·৩

(খ)

প্রতি একরে ফলন—পাউণ্ড

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
মন্দ্র	১,১০১	১,০৫৩	৮৭৭	১,০৬৮	১,০৬২
বোম্বাই	১,০৮৫	১,১১৫	৯৭৪	১,০৫০	৯২২
হায়দ্রাবাদ	৬৪১	৬০৫	৫২২	৬০৭	৭৪২
সমগ্র ভারত	৯৪২	৯০৭	৭৩২	৮৬৪	৮৬৪

(গ)

পাঁচ বৎসরের ফলনের হিসাব

(ব্রহ্ম ব্যতিরেকে)

	টন (হাজার)	একর (হাজার)
১৯৩২-৩৩	২৮,৪৬	৬৮,৭৭
১৯৩৩-৩৪	৩১,৮৬	৭৫,৮৬
১৯৩৪-৩৫	১৭,৪০	৫১,৪১
১৯৩৫-৩৬	২১,১৪	৫১,৯৭
১৯৩৬-৩৭	২৬,৬৬	৬৫,৫০

(ঘ)

পৃথিবীতে চীনাবাদামের চাষ

(১৯৩৬-৩৭)

	হাজার টন
ভারতবর্ষ	৬৫,৫০
চীন	২৭,১৮

	হাজার টন
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	৭,৯২
আমেরিকা	৫,৮৩
নাইজিরিয়া	৩,১৪
জাভা	১,৯৩
আর্জ্জেণ্টাইনা	১,০২

(ঙ)

রপ্তানী

পরিমাণ

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
দানা—(টন)	৪,১২,৫৬৭	৭,৩৯,৪৮৩	৬,১৬,৯৪৭
তৈল—(গ্যালন)	২,৯০,৮০৩	৪,২৭,৭৪০	২৩,১৭,১০২
খইল—(টন)	১,৯৪,২৩৮	২,৩৭,৭৬০	২,৫১,৫৭৬

মূল্য—টাকা

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
	(হাজার)	(হাজার)	(হাজার)
দানা	৬,৬৫,১০	১২,২৮,৫৭	৮,৯৩,৬০
*তৈল	৩,৯৪	৫,৬৫	৩৩,৬৬
খইল	১,১৬,৩০	১,৬৪,৩৪	১,৭৪,৮৬
মোট	৭,৮৫,৩৪	১৩,৯৮,৪৬	১১,০১,৮২

* ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশের অঙ্ক ভিন্ন রাখায় হঠাৎ তৈলের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সালে ব্রহ্মের অংশ ২২ লক্ষ টাকা।

(চ)

রপ্তানী—ক্রেতার সংশ

(১৯৩৭-৩৮)

চীনাবাদাম

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ইটালী	১,১৮,৮৪৬	১,৬৯,৪৭	১৮·৯
জার্ম্মাণী	১,১৫,২৯২	১,৬৩,৪৬	১৮·১
ব্রিটেন	৯১,০৯৮	১,৩৩,১৭	১৪·৯
ফ্রান্স	৮৫,১৩৪	১,২৫,৬৭	১৪·০
নেদারলণ্ড	৭১,৬৬৬	১,০৯,৯৯	১২·২
মিসর	৫২,৪৬৬	৭৫,৯৫	৮·৫
বেলজিয়ম	৪২,৮৪০	৬০,০৫	৬·৭
পর্ত্তুগাল, ডেনমার্ক প্রভৃতি			

খইল

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	১,৩১,২৮০	৯৫,৭৮	৫৪·৭
জার্ম্মাণী	৫৯,১৫০	৩৯,৭৯	২২·৭
বেলজিয়ম	১৬,৪৫৬	১,৫০	৬·৫
নেদারলণ্ড	১৩,৯১৪	৯,৪৭	৫·৪
সিংহল, মিসর প্রভৃতি			

তৈল

	গ্যালন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	১৫,৩৫,৭৪৯	২২,০৮	৬৫.৫
ব্রিটেন	১,৩৭,১৪১	১,৯৪	৫.৭
অন্যান্য	৬,৪৪,২১২	৯,৬৩	২৮.৮

(ছ)

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

(চীনাবাদাম)

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
মদ্র	৫,৬২,৫৩৬	৮,০০,৮৮	৮৯.৬
বোম্বাই	৫৩,৬১৯	৯১,১৪	১০.২
সিন্ধু	৭৫৬	১,২৩	.১
বাঙ্গলা	৩৬	৫	—

তিসি বা মসিনা (Linseed)

তিসির কথা লোকে বহুদিন হইতে জানে, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে ইহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে ইহা একটি মূল্যবান কৃষিলব্ধ বস্তু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আদিকথা

ঔষধ হিসাবে তিসি-ফলের বা দানার বিশেষ উল্লেখ আছে। প্রদাহে স্বেদ বা সেঁক দিবার জন্য তিসির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত। সুশ্রুত, তিসির তৈলকে সামান্য মৎস্য-গন্ধী, ঝাঁঝাল এবং কোষ্ঠশুদ্ধিসহায়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তিসির দানার যত পুরাতন পরিচয় পাওয়া যায়, তুলনায় তিসি তন্তুর সে পরিমাণ পরিচয় পাওয়া যায় না। মনু প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থাদিতে ক্ষুমা বা অতসী বস্ত্রেরও উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ক্ষুমাজাত বস্ত্র বা ক্ষৌম যে রেশম হইতে ভিন্ন বস্তু তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে-গাছ হইতে শণতন্তু পাওয়া যায়, তাহাতে বীজ ভাল হয় না এবং তন্তু-প্রধান বৃক্ষগুলি শীতপ্রধান দেশে বিশেষ ভাবে জন্মিয়া থাকে; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাদের তেজ হয় না। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বীজ জন্মে, সে তুলনায় তন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। পুরাতন গ্রন্থাদিতে বীজ এবং তৈলের যেরূপ ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে তাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে আবহমানকাল বীজবহুল বৃক্ষেরই চাষ হইয়া আসিতেছে। ক্ষৌমবস্ত্র বিশেষ প্রচলিত ছিল না; হয়ত তাহা রেশম হইতে প্রাপ্ত।

বীজপ্রধান ও তন্তু-প্রধান বৃক্ষ

বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন শণের আদিবাস পারস্য উপসাগর এবং কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল। তথা হইতে ইউরোপের নানাদেশে শণ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইউরোপ ও অন্যান্য শীতপ্রধান দেশে বীজের জন্য তিসির চাষ করা হয় না। সুতরাং মূল্যবান শণতন্তু পাওয়া না গেলেও ভারতবর্ষের এদিক দিয়া একটু বিশেষ সুবিধা আছে।

জন্মস্থান

জগতের বাজারে শণতন্তুর বিশেষ দাম আছে, সে কারণে ভারতের মাটীতে প্রচুর বীজ জন্মিলেও এখানে তন্তুপ্রধান বৃক্ষের চাষ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান হওয়ায় বা অন্য কোনও কারণে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৭৯০ হইতে ১৮১০ পর্য্যন্ত

ভারতে তন্তু ও বীজের মিলন চেষ্টা

বিশ বৎসর একাদিক্রমে পরীক্ষা ও গবেষণা করা হইয়াছিল; ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ গবেষণা হয় এবং তখন চেষ্টা হয় যে বীজ ও তন্তুর মিলন একই বৃক্ষে সম্ভব না হইলে, কেবল তন্তু-প্রধান বৃক্ষের চাষ ও উন্নতিসাধন করা। দুঃখের বিষয় তাহাতেও কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ আশা করেন বীজবহুল বৃক্ষে যদিও উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া যায় না, তথাপি যদি ঐ সকল বৃক্ষ হইতে তন্তু পৃথক করিয়া লওয়া যায়, তাহাতে সুলভ রজ্জু প্রস্তুত করা সম্ভব। শণজাত বলিয়া উহা পাটের দড়ি অপেক্ষা সমধিক দৃঢ় হইয়া থাকে। কিছু না পাওয়া গেলেও ঐ শণ হইতে কাগজ তৈয়ারী করা সম্ভব হইবে।

শণতন্তু যখন ভারতের কৃষির কোনও প্রয়োজনীয় অংশ নহে, তখন আমরা পূর্ব্বে বীজের বিষয় আলোচনা করিতে পারি। পৃথিবীতে তন্তুর উৎপত্তি স্থান ও পরিমাণ সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে।

তিসির ফল

ভারতবর্ষে আন্দাজ ৩৬ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৪ লক্ষ ১৮ হাজার টন ফসল হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতে আছে সাড়ে ২৮ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ মোট তিসি চাষের জমির শতকরা ৭৯·৪ ভাগ, আর করদরাজ্যসমূহে বাকী ২০·৬ অংশ বা ৭ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি। ফসলের বেলা দেখা যায় বৃটিশ ভারতে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা ৮৪·৭, আর করদরাজ্যসমূহে ৬৪ হাজার টন বা শতকরা ১৫·৩ ভাগ পড়ে। জমির অনুপাতে বৃটিশ ভারতে ফসল অনেক বেশী হইয়া থাকে।

তিসির চাষ

বৃটিশ ভারতের মধ্যেও সকলস্থানে একই হারে ফসল হয়না, তাহা বলাই বাহুল্য। স্থানের বিভিন্নতা হেতু প্রতি প্রদেশেই

ফলনের তারতম্য আছে। জমির পরিমাণের তুলনায় যুক্তপ্রদেশে তিসির ফলন খুব বেশী; আবার মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে ফলন খুবই কম। পরিশিষ্ট (ক) হইতে প্রদেশ হিসাবে জমি ও ফলনের অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বিভিন্ন প্রদেশ ও ফসলের অংশ

বৃটিশ ভারতে জমি ও ফসলের যে পরিমাণ দেওয়া হইল, তাহা নিতান্ত আনুমানিক বলিয়া মনে করিলেও ভুল হয় না। তিসির চাষ প্রায়ই অন্য কোনও ফসলের সহিত মিলাইয়া করা হয়, আবার কখনও কখনও অন্য তৈল বীজের চাষের জমির ধারে ধারে বেড়ার মত করিয়া গাছ দেওয়া হয়; এই সকল কারণে তিসির চাষ সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বলা বড় কঠিন।

বাঙ্গলা দেশের মধ্যে নদীয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমিতে তিসি চাষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ২৯,৯০০ একর। তাহার পরই মুর্শিদাবাদ, তাহাতে আন্দাজ ২৫,০০০ একর তিসি চাষ হয়। যশোহর, মেদিনীপুর, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক তিসি জন্মিয়া থাকে।

বিভিন্ন জেলার চাষ

বিহারে চম্পারণ জেলায় খুব বেশী জমিতে তিসি চাষ হয় (৯৫,০০০ একর); দ্বিতীয় গয়া (৭৪,০০০), পরে ভাগলপুর (৬৫,০০০), সম্বলপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর জেলায়ও তিসি চাষের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বায়ে বিজাপুরের স্থান প্রথম, সে জেলায় প্রায় ৫০,০০০ একর জমিতে তিসি চাষ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় আহম্মদনগর, তৃতীয় নাসিক। সোলাপুর, ধারোয়ার প্রভৃতি জেলার চাষ উপেক্ষণীয় নহে।

মধ্যপ্রদেশ ও বিরারের মধ্যে দ্রুগ, হোসাঙ্গাবাদ, বিলাসপুরের স্থান প্রায় একই। ইহার প্রতি জেলায় সওয়া লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ একর

জমিতে তিসি চাষ হইয়া থাকে। বলাঘাট, চন্দা, সগর, জব্বলপুর প্রভৃতি জেলাতেও প্রচুর তিসি উৎপাদিত হয়।

পাঞ্জাবে কাঙ্গড়া জেলা এবং যুক্তপ্রদেশে জলাওন (৪৪,৭০০ একর) যথাক্রমে তত্তৎ প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করে। গোরক্ষপুর, গণ্ডা, এলাহাবাদ, বহ্‌রইচ জেলাগুলিই তিসি চাষের জন্য প্রধান। বস্তি, বন্দা, ঝান্সীতেও প্রচুর তিসি চাষ হইয়া থাকে।

এত করিয়া তিসির হিসাব কেহই হয়ত রাখিত না যদি তিসির প্রয়োজনীয়তা না থাকিত। এই সামান্য তিসি ভারতবাসীর ব্যবহারে লাগিয়াও এক বৎসরে চার কোটী টাকা বিদেশ হইতে আনিয়াছে। পৃথিবীর বাজারে কোন্ বৎসর কত পরিমাণ প্রয়োজন হইবে স্থিরভাবে জানা না থাকায় চাষীরা মহা বিপদে পড়ে। প্রতি বৎসরে এক কোটী টাকা পরিমাণের পণ্যের তারতম্য হইয়া পড়ে। সুতরাং যদি পূর্ব্ব হইতে কোনও আভাষ পাওয়া যায়, তাহা হইলে চাষীরা সতর্ক হইবার সুবিধা পায়।

ভারতের বাণিজ্য

বীজ, তৈল ও খইল সকল প্রকার পণ্যই রপ্তানী হয় এবং প্রায় তিন লক্ষ টাকার মূল্যের তৈলের আমদানী হইয়া থাকে। পরিশিষ্ট (খ) এবং (ঝ) হইতে সকল বিষয় বিশদ ভাবে জানা যাইবে।

রপ্তানীর মধ্যে তিসির বীজের অনুপাত মোটামুটি শতকরা ৯০, খইল ৭ আর তৈল ৩; অর্থাৎ বিদেশী যাহা লয় তাহা কাঁচা মাল, তাহা হইতে তাহারা নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিজেদের কাজে লাগায়, আর দেশ বিদেশ হইতে টাকা আনে।

সকল প্রদেশে সমান চাষ হয় না, এবং রপ্তানীর অংশও সকলের সমান নয়। বাঙ্গলা ও বোম্বাই মোটামুটী সকল তিসি রপ্তানী করে; এই সম্পর্কে পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য।

তিসির নানারূপ ব্যবহার থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। সরকারী হিসাবে ধরা হয়, মোট ফসলের পরিমাণ আন্দাজ ৩৫ লক্ষ টন। আর্জ্জেণ্টাইনা তিসি চাষে সকলের অগ্রণী; সেখানে মোট পরিমাণের শতকরা ৫২·৮ অংশ ফসল হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে তিসি চাষ

এই সম্পর্কে রুষগণতন্ত্র, ভারতবর্ষ, ব্রিটেন উরুগায়, পোলণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য; পরিশিষ্ট (ঙ) দ্রষ্টব্য।

তিসি চাসেও ভারতের স্থান নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু তিসি বা তৈল হইতে যে সকল পণ্য প্রস্তুত হয়, তাহা যথারীতি ভারতে কিছুই হয় না। এ সকল বস্তু আমাদের আবার বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে হয়।

ভারতবর্ষের তিসি, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি সকল দেশেই কিছু কিছু গিয়া থাকে। বীজ বিক্রয় হয় চার কোটী টাকার; তন্মধ্যে—ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফরাসী, মিসর, গ্রীক, বেলজিয়ম, নেদারলণ্ড প্রভৃতি প্রধান খরিদ্দার; পরিশিষ্ট (চ) দ্রষ্টব্য।

ভারতের ক্রেতা

ব্রিটেন খইলের প্রাধান ক্রেতা। নেদারলণ্ড, মিসর, বেলজিয়ম ও কিছু কিছু কেনে। সিংহল, ব্রহ্ম, ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্ প্রভৃতি ভারতীয় তিসির তৈল ক্রয় করিয়া থাকে। পরিশিষ্ট (ছ ও জ) দ্রষ্টব্য।

ক্রেতার কোনও স্থিরতা নাই; আজ যাহারা লইল কাল তাহারা হয়ত মোটেই পণ্য লইবে না; সুতরাং সকল সময়েই দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সেদিনও কানাডা অনেক বীজ লইত কিন্তু এখন আর মোটেই লয় না।

বাঙ্গলা দেশে ভাদ্র আশ্বিন মাসে তিসি চাষ সুরু হইয়া থাকে। জমি যত গভীরভাবে কর্ষিত হয় চাষের পক্ষে ততই মঙ্গল। একর-প্রতি চার হইতে ছয় সের বীজ হইলে যথেষ্ট হইয়া থাকে। বীজ রোপণে বিলম্ব হইলে ক্ষেত্রে জলসেচ করিতে পারিলে ভাল হয়; কিন্তু একবার "ফুল আসিবার" পর সামান্য মাত্র বর্ষায় ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। মাঘ ফাল্গুন মাসে সমস্ত গাছ কাটিয়া "খামারে" আনা হয় এবং আছড়াইয়া বা "বাড়ি পিটিয়া" বীজগুলি বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয়। প্রতি একরে ছয় হইতে আট মণ তিসি পাওয়া যাইতে পারে!

ফসল

তিসির আদর তিসির তৈলের জন্য। যদিও সামান্য পরিমাণ তিসি পুল্টিস্ বা সেঁক দিবার জন্য লাগে, কিন্তু তাহাই তিসির রপ্তানীর কারণ নহে। তিসির তৈল আপনা হইতে "টানিক্" বা শুকাইয়া উঠে বলিয়া রঙের কাজে তিসির তৈলের বহু প্রয়োজন। কখনও কখনও তিসির তৈলের সহিত ধাতব লবণ, যথা লিথার্জ্জ (Litharge), রেড লেড (Red lead), লেড এ্যাসিটেট্ (Lead acetate), ম্যানগানিস্ ডায়োক্সাইড (Manganese dioxide) প্রভৃতি মিলাইয়া শীঘ্র শুকাইয়া যাইবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। রঙ এবং বার্ণিশের জন্য, এক রকম নরম সাবান, ছাপার কালি, অয়েল ক্লথ ও লাইনোলিয়ম (oil cloth, linoleum) প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে তিসির তৈলের একান্ত প্রয়োজন। অয়েল ক্লথ, লাইনোলিয়ম তিসির তৈল না হইলে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। লাইনোলিয়ম ও অয়েল ক্লথ ভারতবর্ষ হইতে বহু লক্ষ টাকা বিদেশে লইয়া যায়; সুখের বিষয়—আমাদের দেশেও

তিসির ব্যবহার

অয়েল ক্লথ তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লাইনোলিয়ম, অয়েল ক্লথ হইতে মুল্যবান্ এবং নানারকম রঙে চিত্রিত হওয়ায় অতি সুন্দর; তাহার ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বড় বড় দোকানের বা ধনী গৃহস্থের ঘরের মেঝেতে পাতিয়া রাখা হয়।

তিসির শণ ভারতবর্ষে অতি সামান্যই হইয়া থাকে; সুতরাং শণের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছুই বিশেষ ভাবিবার নাই। সুতা বা সুতালি, দড়ি, দড়া, দৃঢ় চট, ক্যানভাস্ প্রভৃতি কার্য্যে শণ অদ্বিতীয়। তাঁবু, পর্দ্দা, বর্ষাতি (waterproof) প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজে অনেক সময় শণনির্ম্মিত কাপড়ই সমধিক উপযোগী। শণের পরিত্যক্ত অংশ মাল চালানের প্যাকিং প্রভৃতি কাজে বিশেষ লাগে। ফেল্ট (Felt) নামক বস্তু তৈয়ারী করিতে, দৃঢ় কাগজ তৈয়ারী করিতে (যথা, Grease proof butter paper), সিগারেট মোড়া কাগজ প্রভৃতিতে শণ লাগে। বয়লার ঢাকিতে এক প্রকার বস্তু (Boiler-covering composition) করিতে শণের অংশ নিতান্ত কম নয়।

শণের ব্যবহার

বিশুদ্ধ সেলুলোস্ (Cellulose) ও শণ হইতে পাওয়া যায় এবং সেলুলয়েডের নানা বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নকল সিল্ক বা Rayon বহু পরিমাণে তৈয়ারী হয়।

শণের কাঠিও কাগজের কলে, আস্তাবলে ঘোড়ার "বিছানা" করিতে, পশুখাদ্যরূপে এবং জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়।

তিসির খইল পশুখাদ্যরূপে যত ব্যবহার হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় জমির সাররূপে। তিসির খইল অত্যন্ত শক্তিশালী সার এবং কোনও কোনও চাষে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যাহারা জানে তাহারা শণের কোনও অংশ নষ্ট করে না; আর আমরা বিদেশে কেবল বীজ রপ্তানী করিয়া নিশ্চিন্ত। এখানেও কয়েকটী তিসির তৈলের কল হইয়াছে, কিন্তু তাহা অধিকাংশই অবাঙ্গালী পরিচালিত।

শণের ব্যবহার বলা হইল এবং ভারতে তাহা অধিক পাওয়া যায় না তাহা বলা হইয়াছে। শণ পৃথিবীতে মোট ৬৮ লক্ষ টন জন্মায়, তন্মধ্যে ৮০ ভাগ এক রুষ গণতন্ত্র দিয়া থাকে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন ১০০ মণ জন্মিত, রুষে এখন সেখানে ১৭৭ জন্মিতেছে। রুষবাসী সকল কৃষির দিকে যেমন মনঃসংযোগ করিয়াছে, এদিকেও সে বিশেষ অবহিত হইয়াছে। যখন তাহার দেশের আবহাওয়া এ বিষয়ে অনুকূল, তখন সে এ সুযোগ ছাড়ে নাই। জগতে এখনও শণের বহু প্রয়োজন; কে জানে একদিন শণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া পাটের সমকক্ষ হইবে না? আবার পাট দ্বারা শণের কাজ চলে না। অন্যান্য দেশের মধ্যে পোলণ্ড, লিথুয়ানিয়া, বেলজিয়ম, ল্যাটভিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি স্থান শণ চাষের পক্ষে উপযোগী এবং জগতের শণের বাজারে তাহারাও কিঞ্চিৎ বেসাতি করিয়া লয়।

শণের কথা

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশ হিসাবে জমি ও ফলন

১৯৩৬—৩৭

মোট জমি—৩৫,৯৪,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত— ২৮,৫১,০০০ একর ৭৯·৪ %

করদ রাজ্য— ৭,৪৩,০০০ " ২০·৬ %

মোট ফলন— ৪,১৮,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত— ৩,৫৪,০০০ টন ৮৪·৭ %

করদ রাজ্য— ৬৪,০০০ " ১৫·৩ %

প্রদেশ	জমি হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	১১,৩১	৩১·৪	৮৫	২০·৩
যুক্তপ্রদেশ	৮,৯৮	২৪·৯	১,৪৮	৩৫·৪
বিহার	৫,৫০	১৫·৩	৮৪	২০·০
বাঙ্গলা	১,৩১	৩·৬	২৫	৫·৯
বোম্বাই	১,০১	২·৮	৮	—
করদরাজ্য—				
হায়দ্রাবাদ	৪,৬৮	১৩·০	৪৪	১০·৫
ইস্টর্ণ ষ্টেট্‌স এজেন্সী	১,৩০	৩·৬	—	—
কোটা				
(হায়দ্রাবাদ)	৯৪	২·৩	১০	২·৪

(খ)

রপ্তানী—পরিমাণ

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
বীজ—টন	১,৬৪,৭৪৩	২,৯৬,০৩৪	২,২৬,০৩১
তৈল—গ্যালন	৭৭,৮৬৬	১,৩৫,৩২২	২,৬৬,২২৪
খইল—টন	৭১,৭৭৪	৫০,১৯৪	৪৭,০০৩

(গ)

রপ্তানী—মূল্য

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
	হাজার টাকা	হাজার টাকা	হাজার টাকা
বীজ	২,২০,৬২	৪,৩৬,৪৪	৩,৫৬,০৩
তৈল	১,২৭	২,২৮	৪,৩৬
খইল	৪৩,৯৪	৩৫,৫১	৩২,৪১
মোট—	২,৬৫,৮৩	৪,৭৪,২৩	৩,৯২,৮০

(ঘ)

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	১,৮০ ৬৯	৫০'৭
বোম্বাই	১,৫৮,৪৩	৪৪'৫
মদ্র	১৬,৯১	৪'৮

(ঙ)

পৃথিবীর ফলন

(১৯৩৬-৩৭)

মোট—৩৪,৬৫,০০০ টন

	টন	শতকরা অংশ
আর্জ্জেণ্টাইনা	১৮,৩১,৫০০	৫২·৮
রুষগণতন্ত্র	৭,৯২,২০০	২২·৮
ভারতবর্ষ	৪,১৮,০৭০	১২·০
আমেরিকা	১,৪৮,৬০০	৪·২
উরুগায়	১,২৩,২০০	৩·৫
পোলণ্ড	৭০,৯০০	২·০

চায়না, লিথুয়ানিয়া, কানাডা, জার্ম্মাণী, লাটভিয়া ইত্যাদি

(চ)

বীজের ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	১,৬৯,৫৩৫	২,৬৭,৪৯	৭৪·৯
আমেরিকা	৭,২৫২	১১,৬০	৩·২
জার্ম্মাণী	৭,৪২৯	১১,৬০	৩·২
ফ্রান্স	৬,২৯৩	৯,৮৯	২·৭
মিসর	৫,৫১১	৭,১৪	২·০
গ্রীস	৪.০৮৮	৬.০৪	১·৬

বেলজিয়ম, ইটালী ইত্যাদি

(ছ)

তৈলের ক্রেতা

(১৯৩৭-৩৮)

	গ্যালন	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	১,০৪,৮২৫	১,৯০,৬৫৯	৪৩·৮
ষ্ট্রেটস্ সেটল্‌মেণ্টস্	৪২,৭১১	৭৫,৯০৯	১৭·৪
সিংহল	১৪,৬৪৯	২৪,৮৯৯	৫·৩
অন্যান্য	১,০৪,০৩৯	১,৪৪,৫৩১	—

(জ)

খইলের ক্রেতা

(১৯৩৭-৩৮)

	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৩০,২০,৬৮৮	৯৩·২
নেদরলণ্ড, মিসর ইত্যাদি		

(ঝ)

তৈলের আমদানী

	গ্যালন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১,৩৬,৩১১	৩,২৭,১১৮
১৯৩৬-৩৭	১,৪৩,৫১৮	৩,৫৪,৮৫৪
১৯৩৭-৩৮	১,১৪,৫৮০	২,৯১,০১১

(ঞ)

পাঁচ বৎসরের জমি ও ফলন

	একর হাজার	টন হাজার
১৯৩২-৩৩	৩২,৯৯	৪,০৬
১৯৩৩-৩৪	৩২,৬১	৩,৭৬
১৯৩৪-৩৫	৩৪,১০	৪,২০
১৯৩৫-৩৬	৩৪,৫৭	৩,৮৮
১৯৩৬-৩৭	৩৫,৯৪	৪,১৮

(ট)

প্রতি একরে ফলন—পাউণ্ড

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
বাঙ্গলা	৪৪৮	৪৩৪	৪৮০	৩৬৬	৪২৭
যুক্তপ্রদেশ	৩৮৬	৩২২	৩৬১	৩৯০	৩৬৯
সমগ্র ভারত গড়ে	২৭৯	২৫৮	২৭৬	২৭১	২৬১

নারিকেল (Coconut)

নারিকেলের নানা অংশের নানারূপ ব্যবহার থাকার ফলে ইহাকে পণ্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিতে হয়। ডাব ও ঝুনা দুই প্রকার নারিকেলেরই ব্যবহার রহিয়াছে। ঝুনা নারিকেলের শাঁস ও ছোবড়ার বিশেষ প্রয়োজন। শাঁস হইতে তৈল ও খইল পাওয়া যায় এবং সাংসারিক জীবনে দুই বস্তুরই বিশেষ ব্যবহার আছে।

নারিকেল বৃক্ষের বিবরণ দিয়া সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার প্রয়োজন নাই; বাঙ্গালীমাত্রেই ইহার সহিত বিশেষ পরিচিত। প্রধানতঃ লবণাক্ত জলরাশির তীরে যে সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ আছে এবং যে সকল স্থানে বায়ুর আদ্র‍্তা খুব বেশী ও বৎসরে পঞ্চাশ ইঞ্চি বারিপাত হয়, সেই সকল স্থানে নারিকেল গাছ খুব ভাল জন্মে। সমুদ্রতীরে ভাল জন্মিলেও, যদি অন্যান্য অনুকূল অবস্থা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও সমুদ্র হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে নারিকেল গাছ জন্মিতে দেখা যায়। ভারতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী প্রভৃতি নদনদীর অববাহিকা প্রদেশ নারিকেলের জন্য প্রসিদ্ধ। মদ্রে—মলবার ও দক্ষিণ কানাড়া, গোদাবরীর মোহানা ও সমস্ত করমণ্ডল উপকূল; বোম্বায়ে কাথিয়াবাড়, কানাড়া, রত্নগিরি জেলা, করদ রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন এবং বাঙ্গলার নানাস্থানে নারিকেল প্রচুর জন্মে। আন্দাজে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে মোটামুটি তেরো লক্ষ একর জমিতে নারিকেল গাছ আছে। কোনও কোনও বৃক্ষে বৎসরে দুইশত পর্য্যন্ত নারিকেল হয়; কিন্তু প্রতি বৃক্ষে গড়ে ৬০ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়, এরূপ অনুমান অমূলক নহে।

অনুকূল জল হাওয়া

সমুদ্র উপকূলেই জন্মলাভ করিয়া জলে ভাসিয়া নারিকেল নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে খুব বেশী স্থানে নারিকেল গাছ নাই। সিংহল, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মলয়, ফিলিপাইন (মানিলা) প্রভৃতি স্থানে প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায়। আফ্রিকায় মোজাম্বিক, জাঞ্জিবার এবং ওসিয়ানিয়ার ফিজি, নিউগিনি, সলোমন দ্বীপ এবং পশ্চিম সামোয়া হইতে নারিকেলের শাঁস রপ্তানী

নারিকেল-প্রধান দেশ

হয়; পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষকে নারিকেলের আদি জন্মস্থান বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। জলে ভাসে এবং পচিয়া যায় না বলিয়া বহুদিন সমুদ্রে ভাসিয়া ইহা অন্য স্থানে গিয়াছে এবং উপযোগী জলহাওয়া পাইয়া কোনও কোনও স্থানে বাসভূমি স্থির করিয়া লইয়াছে।

পণ্যের নারিকেল

মদ্রে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে নারিকেলের আবাদ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেক মলবারের অংশে পড়ে। মদ্র, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরের নারিকেলই ভারতের পণ্যের বাজারে আসিয়া পৌছে। বাঙ্গলা ও বোম্বায়ের নারিকেল, স্থানীয় লোকের ব্যবহারে লাগিয়া যায়। ভারতের লোকে চার কোটী হইতে পাঁচ কোটি নারিকেল নানারূপে ব্যবহার করে; অবশ্য এই সংখ্যা কোনও বিশেষ হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা হইয়াছে এরূপ বলা যায় না।

সার

লবণ পাইলে নারিকেল বৃক্ষের বৃদ্ধির সুবিধা হয়। কেবল যে সমুদ্রের উপকূলে জন্মে বলিয়া এরূপ মনে করা হয়, তাহা নহে। নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিবার পূর্ব্বে জমিতে লবণ দিয়া ফেলিয়া রাখিয়া কিছুকাল পরে গাছ বসাইলে বৃক্ষের পক্ষে খুব ভাল সারের কাজ করে। যেখানে গাছে ভাল ফল হয় না, সেখানে বর্ষার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় গুঁড়া লবণ দিলে, জলের সহিত বৃক্ষমূলে ঐ লবণ প্রবেশ করিলে বৃক্ষের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

দেশে নানারূপ ব্যবহার ব্যতীত ভারতের পণ্যের তালিকায় নারিকেলের একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থান আছে। নারিকেল এবং নারিকেলজাত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আসে এবং বিদেশে চালান

যায়। এই আমদানী আর রপ্তানীর মোট টাকার পরিমাণ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। আমদানীর মধ্যে নারিকেল শাঁস (শুষ্ক) ও নারিকেল তৈল, ইহাতে প্রায় দুই কোটী টাকা পড়িয়া যায়; পরিশিষ্ট (ঞ ও ঝ) দ্রষ্টব্য)। ডাব ও প্রায় এক লক্ষ টাকার আসে; পরিশিষ্ট (ট) দ্রষ্টব্য। রপ্তানীর মধ্যে নারিকেলের তন্তু বা coir প্রধান। পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য। নানা আকারে ইহার রপ্তানী সওয়া এক কোটী টাকারও উপর; নারিকেল তৈল ও খইল মিলিয়া বাৎসরিক রপ্তানীর পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা; পরিশিষ্ট (গ ও ঘ) দ্রষ্টব্য। এই বাণিজ্য পূর্ব্বে আরও বেশী ছিল। কালক্রমে লোকের প্রয়োজনের নানারূপ পরিবর্ত্তন হওয়ায় এবং অন্যান্য দেশ ক্রমশঃ সজাগ হইয়া পড়ায় এখন আর নারিকেল তৈল প্রভৃতি তত বেশী রপ্তানী হয় না।

বাণিজ্য

যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩-১৪ সালে ৩৮,১৯১ টন নারিকেল শাঁস (copra) আর ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৭৭ গ্যালন তৈল রপ্তানী হয়। যুদ্ধের পরেই ১৯১৮-১৯ সালে শাঁসের রপ্তানী কমিয়া এবং তৈলের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৪৫১ টন ও ৭১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪০৭ গ্যালনে দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা কমিয়া ১৯৩৬-৩৭ সালে ৩৮ টন শাঁস ও ১৪ হাজার ৪১১ গ্যালন তৈলে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। পরিশিষ্টে (গ) যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরের কয়েক বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল। ভারতবর্ষ হইতে ডাবের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতেছে; এই ব্যবসায়ের গতি কিরূপ হইবে বলা কঠিন; পরিশিষ্ট (চ)।

রপ্তানীর হ্রাস

বাঙ্গলা, উড়িষ্যা, বোম্বাই এবং মদ্রেই নারিকেল বেশী মাত্রায় ফলে। কেবল মদ্রেই প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে নারিকেল হয়;

তন্মধ্যে এক মলবারে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একর। পূর্ব্ব গোদাবরী, দক্ষিণ কানাড়া, তাঞ্জোর, উত্তর আর্কট কইম্বাটুর জেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা

প্রদেশ হিসাবে জমি

এবং বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেকটীতে আটাশ হাজার একর জমি আছে। বিহারের পুরী এবং কটক; বোম্বায়ের কানাড়া, কোলাবা, রত্নগিরি জেলাই প্রসিদ্ধ। বাঙ্গলার জমির পরিমাণ মাত্র তেরো হাজার একর এবং খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, নোয়াখালি ও চব্বিশ পরগণা জেলাতেই জমির অংশ বেশী পড়ে।

নারিকেলের সকল প্রকার রপ্তানীর মধ্যে তন্তু ও তন্তুজাত দ্রব্যের স্থানই প্রধান। এক সময় শুষ্ক শাঁস বা খড়িয়াল (খ'ড়েল) অধিক মূল্যের রপ্তানী হইত; এখন তাহার স্থান দ্বিতীয়। পরিশিষ্ট (খ ও ঙ) হইতে এই বিষয়ে সকল অঙ্ক পাওয়া যাইবে।

নারিকেল হইতে ছোব্‌ড়া ছাড়াইয়া লইয়া লবণাক্ত জলে কয়েকমাস ভিজাইয়া রাখার পর পাথরে ফেলিয়া উপর হইতে কাঠের মুগুর দিয়া পিটাইয়া ছোব্‌ড়া বাহির করা হয়। ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার

ছোবড়া প্রস্তুত

এবং সেই কারণেই ভারতের জেলখানায় কোনও কোনও কয়েদীকে কঠোর শ্রমের এই কাজ দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুর ও দক্ষিণ কানাড়ায় এই শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। পশ্চিম উপকূল প্রদেশে, বোম্বাই, উৎকল এবং মহীশূরের কোনও কোনও স্থানে ছোব্‌ড়া বা কাতা প্রস্তুত হয়। মলবার প্রদেশে লোকে হাতে পাকাইয়া দড়ি তৈয়ারী করে; ত্রিবাঙ্কুরে লোকে কলের ব্যবহার প্রচলন করিয়াছে। কিন্তু খরিদ্দারে কলে-প্রস্তুত দড়ি অপেক্ষা অপর জাতীয় দ্রব্যাদি বেশী পছন্দ করে।

এ্যালিপী ও কোচিনে নারিকেল তন্তু হইতে পাপোষ এবং অন্যান্য ম্যাটিং তৈয়ারী করে এবং বহুলোক এই শিল্পকে আশ্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

গুণভেদে নারিকেল-তন্তুর বহুপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল নাম শিল্পীদের গ্রামের নামের অনুকরণে হইত; কিন্তু এখন এক নামের ছোবড়া বা তন্তু অন্যস্থান হইতেও সংগ্রহ করা যায়। কয়েকটী নাম যথা,—আলাপত, আনজেঙ্গো, আড়াডরি, আস্তামুদ্দি, কারওয়া অনেকেরই জানা আছে। তন্মধ্যে 'আলাপত' সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তন্তু অথবা দড়ি এবং সম্পূর্ণরূপে শিল্পীর হাতের কাজ; বাকী সকলগুলিই কলে পাকানো। বুননের জন্য হাতে ভাঙ্গা যে সুতালী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভাইকম, বীচ, কালিকট, বেপুর, কুইলন্দী, কাদালুন্দী, পুনানি, চৌঘাট প্রভৃতি কয়েক প্রকারের আছে।

তন্তুর বিশেষ নাম

সুতালীর নাম

নারিকেল তৈল নানা কারণে মানুষের এক মহা প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহা শুষ্ক বা ঝুনা নারিকেলের শাঁস হইতে ঘানিতে পিষিয়া বাহির করা হয়। যাঁহারা স্বচ্ছ এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন নারিকেল তৈল বাহির করিতে চান, তাঁহারা শাঁস ভাঙ্গিয়া লইয়া জলে দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকেন। ধীরে ধীরে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়। এই তৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া থাকে।

তৈল

শাঁস হইতে ৪০ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায়। এই তৈলের গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে সকল কথা প্রবন্ধের

শেষভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই তৈলে স্নেহভাগ শতকরা ৬৭, আমিষ জাতীয় পদার্থ ৬·৬৯, জলীয় ভাগ বা আর্দ্রতা ৬, শেতসার জাতীয় পদার্থ ১৫-২১, খনিজ ২·৯৯ এবং বাকী উদ্ভিজ্জ তন্তু বা আঁশ। এই সকল বস্তু একসঙ্গে পাওয়া যাওয়াতে নারিকেল তৈল খুব পুষ্টিকর।

বিশ্লেষণ

সর্ব্বপ্রকার নারিকেলের তৈলের মধ্যে "কোচিন" তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মলবার উপকূলের তৈলকেই প্রথমে "কোচিন" তৈল বলা হইত, কিন্তু এখন ব্যবসায়ের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সকল নারিকেল তৈলকে "কোচিন" তৈল বলা হয়, এবং তাহার মূল্যও অনেক বেশী।

"কোচিন" তৈল

ভারতের নারিকেল তন্তুর প্রধান খরিদ্দার জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড। নেদারলণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি সকলেই কম বেশী তন্তু লইয়া থাকে। নারিকেল তন্তুজাত দ্রব্যাদি যথা—"পাপোস" "ম্যাটিং" প্রভৃতি ইংরাজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লয়। বেলজিয়ম খইলের একমাত্র খরিদ্দার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; পরিশিষ্ট (ছ, জ ও ঘ) দ্রষ্টব্য।

তন্তু ও দ্রব্যাদির ক্রেতা

ভারতে আমদানী করা তৈলের বিক্রেতা ষ্ট্রেট্‌স্ সেটল্‌মেণ্টস এবং পরেই সিংহলের স্থান। এই দুই দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। পরিশিষ্ট (ঝ) দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষ হইতে তৈলের রপ্তানী কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে; পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য।

নারিকেলের ব্যবহারের কথা বলিতে গেলে এক সমস্যার ব্যাপার দাঁড়াইয়া যায়। ইহার প্রতি-অংশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার রহিয়াছে।

কচি ডাবের জল ও শাঁস রুগ্ন ও সুস্থ সকল লোকের পক্ষে

বিশেষ উপকারী এবং ভারতবর্ষে ইহার প্রচুর ব্যবহার। এই জল লঘু, স্নিগ্ধ ও বায়ুহারী এবং পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। হিক্কা রোগে এবং অম্ল অজীর্ণ রোগে কচি ডাবের জল সুফলপ্রদ। বৃক্কের কাজ ভাল না হইয়া প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পাইলে, ডাবের জলে উপকার হয়। আজকাল রোগী লইয়া যেখানে পথ্য-সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে চিকিৎসকেরা কচি ডাবের জলের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

ব্যবহার—ডাব

নারিকেলের 'দুধ' বলিলে অনেকে হয়ত বুঝিতে পারিবেন না। ইহা,—ঝুনা নারিকেল, অল্প বাটিয়া লইয়া নিংড়াইলে, পাওয়া যায়। এই "দুধ," সাধারণতঃ চিনির পুলি প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার সময় নিংড়াইয়া বাদ দেওয়া হয়; সেই সময় ইহা পাইবার জন্য বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। ইহা গুরুপাক, খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং বিশেষ পুষ্টিকর। রুটীর ময়দা মাখিয়া এই দুধ মিশাইয়া লইলে উহা অত্যন্ত নরম, মুখরোচক ও পুষ্টিকর হয়।

"দুধ"

নানা অবস্থার নারিকেলের শাঁসের নানারূপ প্রয়োজনীয়তা আছে। কচি বা নেয়াপাতি ডাবের শাঁস লোকে অত্যন্ত পছন্দ করে। ইহা যে কেবল মুখরোচক তাহা নহে, ইহা আয়ুর্ব্বেদীয় মতে পুষ্টিকারক; জ্বর, পিত্ত ও দাহনাশক, অগ্নি উদ্দীপক ও মূত্রবর্দ্ধক। মধ্যাবস্থা বা "দুরমো" নারিকেলের শাঁস হইতে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন হইয়া থাকে, লোকে মুড়ি মুড়কী দিয়া ইহা মহা আগ্রহে ভোজন করে।

শাঁস

ঝুনা নারিকেলের শাঁসই জগতের পণ্যের বাজারে বহুমূল্য বস্তু। এই শাঁসের জন্যই প্রকৃতপক্ষে জগতের বাজারে নারিকেলের বিশেষ

পরিচয়, অবশ্য ইহার সহিত ছোবড়া বা তন্তুর কথা ধরিতে হইবে।

ঝুনার শাঁস

ঝুনা-শাঁস বল ও মাংসপ্রদ এবং শুক্রকারক। মুড়ি প্রভৃতির সহিত এই শাঁস খাওয়া বাঙ্গলাদেশে বিশেষ প্রচলিত এবং অম্লনাশক বলিয়া ইহা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কুচি কুচি টুকরা করিয়া বা সূক্ষ্মভাবে কুরিয়া ব্যঞ্জনে দেওয়া হয়। বহু প্রকার মিষ্টান্ন, যথা চিনির পুলি, রস্করা, লাড়ু, ছাপা প্রভৃতি ঝুনা-শাঁস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চিনির পুলির ছাঁচে কত শিল্পকলা প্রকাশ পাইত তাহা এখন বলিয়া বুঝান কঠিন।

নারিকেল তৈল মানুষের বহু উপকারে লাগে। টাট্কা তৈল লোকে সরিষার তৈল বা ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। টাটকা তৈলে ভাজা লুচি অত্যন্ত মুখরোচক। জ্বালানীরূপে নারিকেল তৈল ব্যবহৃত হয়। প্রসাধনের জন্য ইহার বহুল ব্যবহার এবং এই

তৈল

কারণেই জগতের বাজারে ইহার কেনা বেচা। কেশবর্দ্ধক বলিয়া স্ত্রীলোকেরা অন্য তৈল অপেক্ষা ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করেন। ইহাতে নানারূপ সুগন্ধি মিশাইয়া গন্ধদ্রব্য বা কেশ তৈল প্রস্তুত হয়। ফরাসীদেশে পমেড প্রভৃতি বহুবিধ প্রসাধনের দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয় বলিয়া সেখানে নারিকেল তৈল বেশী মাত্রায় সংগৃহীত হয়। মলম বা প্রলেপ করিতে, কডলিভার অয়েলের ভেজাল হিসাবে, উদ্ভিজ্জ মাখন এবং মার্জ্জারিণ প্রস্তুত করিতে, সাবানের, বিশেষতঃ সমুদ্র জলেও ব্যবহারোপযোগী (marine soap) সাবান, ও বাতির কারখানায় ইহার একান্ত প্রয়োজন। রুটি ও বিস্কুট প্রস্তুতকারকেরা নারিকেল বাটা বা নারিকেল তৈল মিশাইয়া মাখনের অভাব দূর করেন। কাহারও কাহারও মতে এই কার্য্যে নারিকেল তৈল মাখনের অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী।

আমাদের দেশে নারিকেলের ঘৃত বা মাখন কেহ প্রস্তুত করে না, কিন্তু বিদেশ হইতে নকল ঘৃত বা নারিকেলের ঘৃত বলিয়া বহু টাকার দ্রব্য এদেশে আমদানী হইত। এই এক বিরাট ব্যবসায় ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, এদিকে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি, দড়া, কাতা এবং তাহা হইতে থলে, দোলা প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পেটা-ছোবড়া দিয়া চেয়ার গদি প্রভৃতি ভরিয়া কতক পরিমাণে নরম করা হয়। যাঁহারা জানেন,

ছোবড়া

তাঁহারা তন্তু হইতে সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্য, খেলনা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে পারেন। পাপোষ, মাটিতে পাতিবার ম্যাটিং প্রভৃতি নারিকেলের ছোবড়া রূপান্তরিত মাত্র। এই সকল বস্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কিন্তু সম্প্রতি দড়ির পাপোষের এক শত্রু জুটিয়াছে। এখন কলে তৈয়ারী তারের বিদেশী পাপোষ আমাদের দেশের দরিদ্রের উপার্জ্জনের পন্থা নাশ করিতে বসিয়াছে।

নারিকেলের মালার বিশেষ রূপ দেখা যায় ভারতের হুঁকায়। এই হুঁকার কত যত্ন, কত বাহার মালিকের রুচি অনুযায়ী হইয়া

মালা

থাকে, তাহার সীমা নাই। সিঙ্গাপুর, মলয়, মদ্র প্রভৃতি স্থানে নারিকেলের মালা হইতে বহু প্রকার মনোহারী পাত্রাদি প্রস্তুত করে। বাজারে ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। এই খোলা হইতে দেশীয় সস্তা বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে। মালা পোড়াইয়া প্রজ্বলিত পাথর বাটী ঢাকা দিলে উহার মধ্যে “ঘাম” পড়ে, ঐ ঘাম নানারূপ চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

নারিকেল ভস্ম, নারিকেল খণ্ড, নারিকেল লবণ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অম্লশূল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। জলশুদ্ধ

ঝুনা নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ ও যোয়ান ভরিয়া মাটির লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইলে যে ছাই থাকে, তাহাই নারিকেল ভস্ম এবং উক্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ

নারিকেলের পাতা বিশেষ কাজে লাগে। দরিদ্র ইহা দ্বারা মাদুর চাটাই প্রভৃতি বুনিয়া লয়, ঘর আচ্ছাদন করে, জ্বালানী রূপে ব্যবহার করে। নারিকেলের কাঠি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, সম্মার্জ্জনী বা ঝাঁটা তৈয়ার করিতে হইলে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এই কাষ্ঠাংশ থাকাতে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া তাপ বেশী পাওয়া যায়। হিন্দুর গুরুনিপাতের পর হবিষ্যান্ন পাক করিবার জন্য নারিকেল পাতার জ্বাল দিবার বিধি আছে।

পাতা

নারিকেল ছোবড়া ও মালা পল্লীর দিকে জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোবড়া হইতে প্রাপ্ত 'ফুঁকা কয়লা' অত্যন্ত হাল্কা এবং শীঘ্র ধরিয়া উঠে; সে কারণে অপর কয়লা হইতে ইহার আদর বেশী। বর্ত্তমানে ইহার এক নূতন এবং অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিষাক্ত বাষ্পদ্বারা জীবননাশের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং সেই বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, মুখোষ পরা দরকার। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই মুখোষ তৈয়ারী করিতে নারিকেলের ছোবড়ার কয়লা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। মনে হয় এই হাল্কা কয়লার মধ্য দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের সুবিধা আছে বলিয়া ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জ্বালানী ও কয়লা

নারিকেলের ফুল এবং নূতন শিকড় উভয়ই নানারূপ রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে।

নারিকেলের 'মাথি' অর্থাৎ কাণ্ডের শিরোদেশে পাতার মধ্যে যে নরম অংশ থাকে, তাহা খাইতে অতিশয় সুস্বাদু এবং লোকে পাইলে ব্যঞ্জনাদি করিয়াও খাইয়া থাকে। নানাস্থানেই গাছ হইতে মাদক বা তাড়ি প্রস্তুত করে এবং কোথাও বা রস হইতে পাটালিগুড় এবং পরিষ্কার চিনি তৈয়ারী করে।

"মাথি" ও রস

গাছ কাটিলে কেহ কেহ চালাঘরের "আড়া", পুকুরের ঘাট বাঁধিবার ধাপ প্রভৃতি করিয়া লয়। এই কার্য্যের জন্য তালগাছ বেশী উপযোগী।

হিন্দুর মাঙ্গলিক কাজে মঙ্গলঘটের উপর সশীষ ডাব না বসাইলে শুভলক্ষণ প্রকাশ পায় না; জগন্মাতাকে আহ্বান করিতে হইলে সশীষ ডাবযুক্ত ঘটস্থাপনা না করিলে পূজার কার্য্য আরম্ভ হইবার উপায় নাই।

মাঙ্গলিক

পরিশিষ্ট

(ক)

পৃথিবীর বাজারে বিভিন্ন দেশ হইতে নারিকেল শাঁসের রপ্তানীর পরিমাণ

দেশ	টন
ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জ	৫,০৪,০০০
ফিলিপাইন	৫,০৩,০০০
মলয়	১,৩২,০০০
সিংহল	৭,০৭,০০০
নিউগিনি	৬৭,০০০
মোজাম্বিক	৩১,০০০

দেশ	টন
ফিজি	২৩,০০০
ফরাসী উপনিবেশ	২১,০০০
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	২১,০০০
জাঞ্জিবার, সামোয়া, ইত্যাদি।	

(খ)

রপ্তানী—

নারিকেল তন্তু বা ছোবড়া

অসংস্কৃত (ছোবড়া)	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১৮১	৩১,৩১১
১৯৩৬-৩৭	১৩৮	২৩,৩০২
১৯৩৭-৩৮	১১৭	২৪,০৪৯
সংস্কৃত (তন্তু, সুতালী, দড়ি)	হন্দর	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৬,০২,৫২৪	৬০,৫৮,৪২৮
১৯৩৬-৩৭	৪,৭৭,৯৭৭	৪৬,৫২,৩৮০
১৯৩৭-৩৮	৬,৫৫,১৬৯	৬৭,৯৫,২০৯
পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতি	হন্দর	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৫৫,৫৯৭	১৭,৫৯,৩৯৭
১৯৩৬-৩৭	৪৯,৯১৮	১৫,৮৫,৬৯৩
১৯৩৭-৩৮	৬২,৪৩২	২৬,০১,৯৯১

বিবিধ	হন্দর	টাকা
১৯৩৫-৩৬	২৬,৩৪৬	৯,৩১,৩৮৮
১৯৩৬-৩৭	২১,৭৫৯	৮,৩৪,৯৯৩
১৯৩৭-৩৮	২৬.১০১	১০.২২.৭১৬

সংস্কৃত তন্তু ও দ্রব্যাদি—মোট

১৯৩৫-৩৬— ৮০,৪৯,২১৩ টাকা
১৯৩৬-৩৭— ৭০,৭৩,০৬৬ "
১৯৩৭-৩৮— ১,০৪,১৯,৯১৬ . "

(গ)

রপ্তানী—নারিকেল তৈল

	হাজার গ্যালন	হাজার টাকা
১৯০৯-১০ হইতে		
১৯১৩-১৪ গড়ে প্রতি বৎসর	১৭,৩৭	৩১,১৫
১৯১৪-১৫ হইতে		
১৯১৮-১৯ গড়ে "	৩২,৫৯	৬৫,৩৮
১৯১৯-২০ হইতে		
১৯২৩-২৪ গড়ে "	১৭,২০	৫০,৯৩
১৯৩৫-৩৬	৩৩	৪৩
১৯৩৬-৩৭	১৪	২৩
১৯৩৭-৩৮	৮০	১,৩১

ক্রেতাগণের মধ্যে ব্রিটেন, মস্কট, আরব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(ঘ)

রপ্তানী—খইল

	পরিমাণ	মূল্য
	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৩,৮২৫	২,৫৪,৩৩১
১৯৩৬-৩৭	৪,১৮৭	২,৯৪,১০৬
১৯৩৭-৩৮	৮,৩৯৮	৫,৭১,১৩৬

৫৭১ হাজারের মধ্যে ৫৬৫ হাজার টাকার মাল একা বেলজিয়ম লইয়াছে।

(ঙ)

রপ্তানী—নারিকেল বীজ

(Copra)

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৪৮	১৭,৬৫২
১৯৩৬-৩৭	৩৮	১৫,১৫৮
১৯৩৭-৩৮	১৩২	৪৪,৮৮৩

১৯১৩-১৪ সালে ৩৮,১৯১ টন রপ্তানী হইয়াছিল।

(চ)

রপ্তানী—নারিকেল

	সংখ্যা	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৬৮,৬৩৫	৪,০০৭
১৯৩৬-৩৭	২,০০,২৭৪	১২,৬৩৮
১৯৩৭-৩৮	৫৯,০৪,৩৩৯	২,৫৩,৪৬০

(ছ)

সংস্কৃত তন্তুর ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট ৬৭,৯৫,২০৯৲ টাকা

	হন্দর	টাকা	শতকরা অংশ
জার্ম্মাণী	১,৫৯,৪০৭	১৫,৬৫,৫৫৯	২৩·০
বৃটেন	৯০,৯৪৬	৯,৩৮,৬৫৪	১৩·৮
নেদারলণ্ড	৭৬,৩৩১	৮,৫২,৮৩৫	১২·৫
বেলজিয়ম	৫৪,৩১৪	৫,৪৩,৯৬৯	৮·০
ফ্রান্স	৩৯,৮৮৭	৩,৯৩,১৫৭	৫·৮
ইটালী	৩৪,৮৬৮	৩,৮৫,৩০৭	৫·৬
আমেরিকা	৩০,৯৯৩	৩,০৫,৭৭৮	৪·৫
অন্যান্য	১,৬৯,৩২৩	—	২৬·৯

(জ)

পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতির ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট—২৬,০১,৯৯১

	হন্দর	টাকা	শতকরা অংশ
বৃটেন	৪৩,৭৯৬	১৮,৯২,৬০৭	৭২·৭
আমেরিকা	৪,৯৭৯	১,৫৭,৩৯৪	৬·০
অ	১৩,৬৩৭	৬,৫১,৯৯০	২০·০

(ঝ)

আমদানী—তৈল

	হাজার গ্যালন	হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	৮৫,৪৪	৯০,১৯
১৯৩৬-৩৭	৭৮,২৯	৯১,৪১
১৯৩৭-৩৮	৬৭,৯০	৭৮,৫৩

ভারতে তৈলের বিক্রেতা

১৯৩৭-৩৮

	টাকা	শতকরা অংশ
ষ্টেট্স সেট্ল্মেণ্টস	৪৫,৭৪,৬৮০	৫৮·২
সিংহল	৩২,২৭,৬১৫	৪১·০
অন্যান্য	৫০,২৯৩	·৮
মোট—	৭৮,৫২,৫৮৮	

(ঞ)

আমদানী—নারিকেল শাঁস (শুষ্ক)

(Copra)

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৪৫,৩২১	৭৮,৫৯,৭৬৩
১৯৩৬-৩৭	৫২,১৮১	১,০৯,৫৮,৪৬৬
১৯৩৭-৩৮	৪৯,৩৮৩	৯৫,৬৭,৭৫৭

বিক্রেতার অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	টাকা	শতকরা অংশ
সিংহল	৮৭,৬৪,৫৬১	৯১·৬
অপরাপর	৮,০৪,১৯৬	৮·৪

ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেণ্টস্ ১৯৩৫-৩৬ সালে ১২,৪২,৫৮১৲ টাকার এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ৫,৮১,৯৩৪৲ টাকার মাল ভারতে রপ্তানী করে। ১৯৩৭-৩৮ সালের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য নহে।

(ট)

আমদানী—নারিকেল

	সংখ্যা	টাকা
১৯৩৫-৩৬	২,০০,২২,৫৪০	৮,২৪,০৪০
১৯৩৬-৩৭	১,৬৬,৩৪,৪৫৮	৭,৪৩,২২৬
১৯৩৭-৩৮	৩৬,২৪,৪৭৪	১,১৬,৯৪৪

নারিকেল ছোবড়া বা তন্তুর আমদানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

কার্পাস বীজ

(Cotton-seed)

তন্তুবিভাগে তূলার কথা সমস্তই বলা হইয়াছে; তাহার ব্যবহার আজকাল আর লোককে বুঝাইয়া বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু তূলার বীজ যে জগতে কত অদ্ভুত কাজে লাগে তাহার ধারণা অনেকেরই নাই।

যেখানে তূলা আছে, সেইখানেই তূলার বীজ আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বীজ হইতে তূলা ছাড়ানো এক বিরক্তিকর ব্যাপার। তাহার পর তূলার ব্যবহার জানা আছে বলিয়া তূলা স্বতন্ত্র করিয়া লইবার পর দানাগুলি গৃহস্থের সংসারে এক জঞ্জাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই সকল দানা একসঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিবার পর

আবর্জ্জনা

গৃহস্থ বিরক্ত হইয়া একদিন ঘরের কানাচে গাদা করিয়া ফেলিয়া দেয়; তখন জল পাইলে এক সঙ্গে অজস্র গাছ জন্মিয়া আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া বাড়িতে থাকে। পরে পালিত পশুর কৃপায় বা গৃহস্থের হঠাৎ একদিন বাড়ীর আশপাশ সাফ করিবার ইচ্ছার ফলে ইহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই আমাদের দেশে মোটামুটী তূলার বীজের প্রথম এবং শেষ পরিণতি।

তূলার বীজ কিন্তু এক বহুমূল্য বস্তু। ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে জানিলে কেবল যে আবর্জ্জনা দূর হয় তাহা নহে, ইহা হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন হওয়া সম্ভব। যাহারা সকল জিনিসের ব্যবহার জানে, তাহারা ইহা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করে এবং ইহাকে নানা কাজে লাগায়।

তূলা ও বীজের অনুপাত

সাধারণতঃ হিসাব করা হয়—তূলা ও তাহার বীজের অনুপাত ২ঃ১, সুতরাং জগতে বহু সহস্র টন তূলা বীজ প্রতি বৎসর যে পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা কি ব্যবহার করি জানিনা, কিন্তু যাহারা নানা জিনিসের সন্ধান রাখে, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরই কয়েক লক্ষ টাকার তূলাবীজ ও তূলার খইল লইয়া যায়। পরিশিষ্ট (ক) হইতে ইহার হিসাব পাওয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে এ হিসাব কিছুই নহে।

অনাদৃত অবস্থায় বহু সহস্র টন তূলাবীজ নষ্ট হইয়া যায়। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তূলাবীজ পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় এ রপ্তানী কিছুই নহে; অথচ এদেশে তুলা-বীজের কোনও বিশেষ যে ব্যবহার আছে তাহা অনেকেরই জানা নাই।

বর্ত্তমান সালের হিসাব দেওয়া সম্ভব হইল না, তাহা ছাড়া এদেশে তূলাবীজের প্রকৃত হিসাব রাখা হয় না। তূলা যে প্রদেশে অধিক মাত্রায় জন্মায়, সেইখানেই বীজ বেশী পাওয়া যায়।

ভারতে বীজের পরিমাণ

আন্দাজ করা হয় ভারতবর্ষে মোট ২৬ লক্ষ·৪৩ হাজার টন তূলাবীজ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে বৃটিশশাসিত ভারতে ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা ৬৫·৩ আর করদরাজ্যসমূহে ৯ লক্ষ ১৭ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা ৩৪·৭ ভাগ হইয়া থাকে। পরিশিষ্টে (খ ও গ) বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল।

তূলার পরিমাণ হিসাবেও পঞ্চনদের স্থান প্রথম; বোম্বাই ও মধ্য-প্রদেশ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

তূলাবীজ এত প্রয়োজনীয় বস্তু যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যোপযোগী পণ্য বলিয়া যে কয়েকটামাত্র জিনিসের হিসাব রাখা হয়, তূলা বীজ তাহার মধ্যে একটী। যে সকল দেশেই তূলা আছে, সে সকল স্থানে তূলার বীজও আছে। সে কারণে আমেরিকা, তূলার ন্যায়, এ বিষয়েও জগতের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পৃথিবীতে বীজের পরিমাণ

প্রকৃত হিসাব যে পাওয়া যায় না, সে বিষয়ে একপ্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। তথাপি মনে হয় ভারতবর্ষে যেরূপ হিসাব রাখা হয়, তাহা অপেক্ষা অন্যান্য দেশ কিছু ঠিক হিসাব রাখে।

হিসাবরক্ষকরা আন্দাজ করেন সারা পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ১ কোটী ৪০ লক্ষ ৭৮ হাজার টন তুলাবীজ সংগৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহার পরিমাণ যে নিতান্ত সামান্য নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

আমাদের দেশে কিছু কিছু তূলার তৈল নিষ্কাসিত হইয়া থাকে; ভারতবর্ষ হইতে তূলার বীজ ব্যতীত তূলার খইল যে রপ্তানী হয়, তাহাই কতকটা প্রমাণ। কিন্তু এই তৈল দেশে যে কি কাজে লাগে তাহা আমাদের সঠিক জানা নাই। তবে বিদেশে এই তৈল যে বিশেষ আদৃত হয়, তাহা তাহার নানারূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায়।

বীজের আধুনিক ব্যবহার

বীজগুলি হইতে মোটামুটী তূলা ছাড়াইয়া লইবার পরও যে ক্ষুদ্র তন্তু বীজের গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা আবার নূতন করিয়া ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তাহার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম, ঐ সামান্য পরিমাণ তূলাও ব্যবসায়ী নষ্ট করিতে চায় না। দ্বিতীয়, যতই তূলা লাগিয়া থাকিবে, বীজ হইতে তৈল নিষ্কাসনের পক্ষে ততই অসুবিধা। এই জাতীয় তূলা হইতে জামা প্রভৃতির প্যাড (pad) দিবার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া মাল চালান দিতে, কোনও বস্তু আঘাত হইতে রক্ষা করিতে এই তূলা ব্যবহৃত হয়।

বীজের কালো রঙের খোসাগুলি স্বতন্ত্র করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহা সাধারণতঃ তৈল নিষ্কাসিত করিবার আগেই স্বতন্ত্র করা হয়। এই খোসাগুলি ভাঙ্গিয়া এক প্রকার ভূষির মত বস্তু প্রস্তুত করে

বীজের খোসা

এবং তাহা গোজাতীয় পশুর খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাহারাও বা উহাকে চুল্লীতে দাহ্যবস্তুরূপে ব্যবহার করে এবং উহার ভস্মকে অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করে; কারণ ঐ ভস্ম এক জাতীয় উৎকৃষ্ট সার পদার্থ। পরীক্ষা

দ্বারা জানা গিয়াছে এই খোসা হইতে বা পূর্ণ বীজ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং যাহা আবর্জ্জনারূপে লোককে বিরক্ত করিতে পারে, উপায় জানিলে তাহাই অর্থাগমের সহায়তা করিয়া থাকে।

এই বীজ হইতেই তৈল পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ভাল করিয়া খোসা ছাড়াইয়া লওয়া হয়। ইহার প্রধান কারণ, ইহাতে তৈল বেশ পরিষ্কার হয়। পরে ঐ খইল গরুকে খাইতে দেওয়া হয় বলিয়া বীজের শাঁস হইতে খোসা দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ঐ খোসার ব্যবহার আছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। খোসা ছাড়াইয়া লইবার পর কোন কোনও স্থানে শাঁস হইতে ঘানি প্রভৃতির দ্বারা তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়; তাহাতে প্রায় শতকরা ১২ হইতে ১৫ ভাগ বা ততোধিক তৈল পাওয়া যায়; বলা বাহুল্য, এই তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা স্বাদ ও বর্ণহীন। রন্ধনকার্য্যে ইহার বহুল ব্যবহার। বাজারে অলিভ অয়েল বলিয়া বা অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা বিক্রীত হইয়া থাকে। মার্জ্জারিণ বা নকল মাখনের প্রধান উপকরণ ষ্টিয়ারিণ (Stearine) এই জাতীয় তৈল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তৈল

খোসা ছাড়াইবার পর, শাঁসগুলিকে সামান্য উত্তাপ দ্বারা তৈল বাহির করিবার সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে তৈলের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তৈলের গুণ হ্রাস পায়। শাঁসের ওজনের শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগও তৈল এই প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়।

তুলা-তৈলের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। অপরিষ্কৃত তৈল হইতে সাবান ও ময়লা ষ্টিয়ারিণ হইয়া থাকে।

প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তৈলের নাম দেওয়া হয় (১) Summer yellow oil ; (২) Winter yellow oil.

তৈলের ব্যবহার

প্রথম বিভাগে মোটামুটী সাবান, অলিভ অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত তৈল, cottolene বা তুলার তৈল, butterine বা নকল মাখন এবং রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত তৈল পড়ে। দ্বিতীয় বিভাগে (winter yellow oil-এ) তূলা-তৈলজাত ষ্টিয়ারিণ, শূকর চর্ব্বির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত বস্তু, মাখন ও বাতি পড়ে।

তাহা ছাড়া খনির মধ্যে ব্যবহারোপযোগী দীপ-তৈল প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠের ক্ষয়-রোধ ও ইস্পাতের শক্তিরক্ষণের (steel tempering) বা খাঁটী ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এই গুণের জন্য ইহার আদর অত্যন্ত বেশী। "টার্কি রেড অয়েল" (Turkey red oil) নামক বস্তু এই তৈল হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। তন্তুজাত বস্ত্রের রঙ ধরাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

খইল

তৈল বাহির করিয়া লইবার পরও যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। গৃহপালিত পশুখাদ্য হিসাবে খইলের প্রচুর ব্যবহার আছে। গাভীর পুষ্টি ও দুগ্ধবৃদ্ধির জন্য খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে শক্তিবৃদ্ধি করে বলিয়া হালের গরু হইতে মহিষকে দিনে আড়াই হইতে তিন সের পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে ; ইহাতে সরিষাব খইল কম ব্যবহার করিলেও কোনও ক্ষতি নাই। পশুখাদ্য ব্যতিরেকে জমির সার হিসাবে খইলের ব্যবহার আছে। যাহাদের দেশে বীজ হইতে তৈল বাহির করে, তাহারাই ইহার সম্যক্ ব্যবহার জানে। গত সালেও ভারতবর্ষ হইতে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের খৈল রপ্তানী হইয়াছে ; পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

তূলাগাছের ডাঁটা হইতে একপ্রকার তন্তু পাওয়া যায়। পাতা ছাড়াইয়া ফেলিবার পর (Watt সাহেবের মতে), ৫ টন ডাঁটায় এক টন ছাল পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে আন্দাজ ১,৫০০ পাউণ্ড বা প্রায় দুই মণ তন্তু পাওয়া যাইতে পারে। পাটের পরিবর্ত্তে এই তন্তু সহজেই ব্যবহার করা চলে।

তন্তু

দেশীয় ঔষধরূপে কার্পাস বৃক্ষের মূল-ত্বকের ব্যবহার প্রচলিত আছে; তাহা হইতে এখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আধুনিক ঔষধও প্রস্তুত হইয়াছে। আর্গটের পরিবর্ত্তে ইহাকে প্রয়োগ করা হয়। ইহা গর্ভস্রাবকারী, রজঃপ্রবর্দ্ধক ও আশুপ্রসবকারক। আজকাল Decoction of cotton root bark ও Liq. Extract of cotton root bark প্রভৃতি আর্গটের স্থলে চলিতেছে।

কার্পাস বীজের কথা আরও বলা প্রয়োজন। তূলার সহিত যে বস্তুর ১ : ২ অনুপাত, তাহার ব্যবহার করিতে না পারিলে স্বতঃই তূলার দাম বেশী পড়িয়া যায়। আমেরিকা এই বীজের বহুল ব্যবহার জানে বলিয়া তূলার দাম তাহারা কম ধরিলেও তাহাদের ক্ষতি নাই। যেটী আসল বস্তু তাহারই লোকে দাম ধরে, তাহার পর ঝড়্তি যাহা পড়িয়া থাকে তাহা হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লাভের। আমেরিকা যে ভাবে তূলার বীজের ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে তূলার সহিত তূলার বীজের মূল্য সমান ধরিলেও তাহাদের ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশে তূলার বীজের সম্যক মূল্য লোকে বুঝিতে পারিলে, সর্ব্বেব মঙ্গল বুঝিতে হইবে।

(ক)

রপ্তানী

বীজ—

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৭৩০	৪৫,২১৫
১৯৩৬-৩৭	৯,০০৩	৫,০১,৭৬৪
১৯৩৭-৩৮	৫,০০৮	৩,০৭,২৩৮

খইল—

১৯৩৫-৩৬	৬,২১৩	২,৯২,১৪৭
১৯৩৬-৩৭	৯,০৯৬	৫,৪৩,৮৩৩
১৯৩৭-৩৮	৮,১৬৬	৫,৩৩,৫৪২

১৯৩৭-৩৮ সালে সমস্ত খইলই ব্রিটেন লইয়াছে।

(খ)

ব্রিটিশ ভারতে ফলনের পরিমাণ ও প্রদেশসমূহের অংশ

মোট—১৭,২৬,০০০ টন

	টন	শতকরা
পঞ্চনদ	৪,৫৮,০০০	১৯·৬
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৩,১৫,০০০	১২·৫
বোম্বাই	২,৯৩,০০০	১১·১
মাদ্রাজ	২,৫৯,০০০	৯·৮
সিন্ধু	১,৪৮,০০০	৫·৬
যুক্তপ্রদেশ	১,০৫,৭০০	৪·০
বাঙ্গলা	১৪,৫০০	·৬৬

(গ)

করদরাজ্যে ফলন ও বিভিন্ন রাজ্যের অংশ

মোট ২,১৭,০০০ টন

	টন	শতকরা অংশ
বোম্বাই রাষ্ট্রসমূহ	৩,২২,০০০	১২·২
হায়দ্রাবাদ	২,৪০,৫০০	৯·১
পঞ্চনদ রাষ্ট্রসমূহ	১,৫৮,৬০০	৬·০
মধ্যপ্রদেশ রাষ্ট্রসমূহ	৭১,০০০	২·৭
বরোদা	৩৭,০০০	১·৪
রাজপুতানা	৩১,৭০০	১·২
গোয়ালিয়র	৩১,৫০০	১·২
খয়েরপুর	৮,০০০	·৩
মহীশূর	৪,৭০০	·১৮

ত্রিপুরা, রামপুর প্রভৃতি রাজ্যসমূহে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

পৃথিবীর ফলন ও নানাদেশের অংশ

মোট ১,৪০,৭৮,০০০ টন

	হাজার টন	শতকরা অংশ
আমেরিকা	৪৯,৪৫	৩৫·১
ভারতবর্ষ	২৬,৪৩	১৮·৭
চীন	১৯,৬০	১৩·৯
রুশগণতন্ত্র	১৫,৩৪	১০·৮
ব্রেজিল	৯,০১	৬·৪

	হাজার টন	শতকরা অংশ
মিসর	৮,৫১	৬·০
মেক্সিকো	১,৪৪	১·০
উগাণ্ডা	১,৩৮	·৯
আর্জ্জেণ্টাইনা	১,৩৪	·৯
তুরস্ক	১,২৪	·৮
সুদান	৯৯	·৭

এরণ্ড বা রেড়ী

(Castor Seed)

ভারতে রেড়ীর চাষ হইলেও ইহা একটী উপেক্ষিত বস্তু। নিয়মিত চাষ ও তাহার প্রকৃত ব্যবহার আমাদের এখনও আয়ত্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল দ্রব্যের কিছুমাত্রও রপ্তানী আছে, তাহারই দিকে নজর দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে যাহার কোনও বিশেষ কাজ আছে, তাহা বিদেশীরা বুঝিয়াছে এবং আমাদের দেশ হইতে কাঁচা অবস্থায় লইয়া যাইতে সুরু করিয়াছে।

আদি বাসস্থান

এরণ্ড বা রেড়ী গাছ বহু প্রকারের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রচুর জন্মায় এবং পর্ব্বতগাত্রে ছয় হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ প্রদেশে জন্মিতে দেখা যায়। আফ্রিকা দেশে ইহার আদিম নিবাস মনে করিলেও

ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং নানা স্থানে বহুদিন আবাদও হইতেছে।

প্রধানতঃ এরণ্ড গাছ দুই জাতীয়। মধ্যমাকার বৃক্ষ জন্মিয়া কয়েক বৎসর জীবিত থাকে, আবার ক্ষুদ্রাকারের গাছ জন্মিয়া বৎসরান্তে চাষের পর মরিয়া যাইতে দেখা যায়। অত্যধিক বর্ষায় ইহা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু চারা বাহির হইবার জন্য প্রচুর বর্ষা একবার বিশেষ প্রয়োজন। চাষ করিলে ইহারা জমির উর্ব্বরাশক্তি বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া ইহার চাষের অন্য বিপদ এই যে ইহার পাতা নানারূপ কীটের, বিশেষতঃ গুটীপোকার, প্রিয় খাদ্য এবং তাহারা এত দ্রুত ইহার সমস্ত পাতা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে যে, শীঘ্রই চাষের ঘোরতর হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

চাষের বিপদ

রেড়ীর চাষেরও দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। একটী, রেশমের গুটী পালন করিবার জন্য ইহার পাতা বিশেষ উপযোগী; অপরটী, রেড়ীর তৈলের জন্য প্রয়োজন। যন্ত্রাদি-ব্যবহারের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়াছে অন্যান্য সকল প্রকার তৈল অপেক্ষা একটী বিশেষ ব্যবহারের জন্য ইহার তুলনা নাই।

প্রয়োজনীয়তা

প্রথম চাষ শীতের ফসল হিসাবে যাহা করা হয় তাহা ভাদ্র আশ্বিনে রোপণ করা হয় এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ঐ বীজ পরিপুষ্টি লাভ করে। দ্বিতীয়, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রাকার দুই জাতীয় বৃক্ষই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে রোপিত হয় এবং পৌষ-মাসে ঐ সকল গাছের বীজ সংগ্রহ করা হয়। মোট কথা চেষ্টা করিলে সকল সময়েই কম বা বেশী পরিমাণে বীজ পাওয়া কঠিন নয়।

ফসল

ভারতের বহুস্থানেই রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু তুলনায় বাঙ্গলা দেশে এই চাষের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ভারতের মোট চাষের জমির পরিমাণ চৌদ্দ লক্ষ একরের উপর। ফসলের হিসাবে কমবেশ সওয়া এক লক্ষ টন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের জমি ও ফলন

বৃটিশ ভারতে চার লক্ষ সাত হাজার একর জমিতে চাষ হয়, তাহা মোট জমির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ (২৯%); আর করদ রাজ্যসমূহে দশ লক্ষ একর অর্থাৎ শতকরা ৭০। ফসলের বেলায় অবস্থা কিন্তু ঠিক সেরূপ নয়। ইহাতে বৃটিশ ভারতে শতকরা ৩৭·৫ ভাগ পড়ে। ৪৮ হাজার টন বৃটিশ ভারতে, আর করদরাজ্যসমূহে কমবেশ ৮০ হাজার টন ফসল পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মদ্রের চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ মোট ফসলের এক পঞ্চমাংশ ঐ স্থানেই পাওয়া যায়। পরে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বিরার এবং বিহারের স্থান। উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশেও কিছু চাষ হয়। পরিশিষ্ট (ক) হইতে প্রতি প্রদেশের জমি ও ফলনের হিসাব ও শতকরা অংশ জানিতে পারা যাইবে। দেখা যায় মদ্র, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে জমির অনুপাতে ফলন অনেক বেশী।

বিভিন্ন প্রদেশের চাষ

মদ্রের মধ্যে অনন্তপুর জেলার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে আন্দাজ সত্তর হাজার একর জমিতে রেড়ী চাষ হয়। কর্ণৌল, গণ্টুর, নেলোর,—প্রত্যেকটীতে ত্রিশ হাজার একরের উপর চাষের জমি আছে এবং বেলারী ও সালেমেও প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। আসামের কামরূপ; বিহারের ভাগলপুর, পালামৌ, পাটনা; উড়িষ্যার কটক; বোম্বায়ের আহম্মদাবাদ,

জেলার পরিচয়

কয়রা, সুরাট এবং পশ্চিম খান্দেশ; মধ্যপ্রদেশ ও বিরারের বিলাসপুর প্রভৃতি জেলাতেও উল্লেখযোগ্য রেড়ীর চাষ হয়।

করদরাজ্যসমূহে রেড়ীর চাষ খুব বেশী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভারতের প্রায় ৭০%। ভারতের মধ্যে হায়দ্রাবাদের স্থান প্রথম। সমস্ত জমির ৫৫.৫% ও ফসলের ৫১.৬% এক হায়দ্রাবাদের ভাগে পড়ে। অন্যান্য রাজ্যের পরিচয় পরিশিষ্ট (ক) হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

করদরাজ্যে চাষ

বৃটিশ ভারতের চাষের হিসাবেও দেখা গিয়াছে জমির অনুপাতে বোম্বায়ের ফসল খুব বেশী; করদরাজ্যসমূহের হিসাবেও বোম্বায়ের উৎপাদিকা শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

রেড়ীর বিষয়ে ভারতবর্ষের বিশেষ সুবিধা এই যে—এত বড় প্রয়োজনীয় ফল পৃথিবীতে খুব বেশী দেশে জন্মায় না। জগতের প্রয়োজনের অধিকাংশ ভাগই ভারতবর্ষ সরবরাহ করিয়া থাকে। উগাণ্ডা, কেনায়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোনও কোনও অংশে রেড়ী পাওয়া যায়; আর ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হইয়া থাকে।

পৃথিবীর চাষ

সাধারণতঃ বীজ হইতে সকল প্রকার তৈল নিষ্কাসনের জন্য দুইটি পন্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথম, শীতল অবস্থায় যন্ত্রাদির দ্বারা চাপ দিয়া; দ্বিতীয়, ঐ বীজকে উত্তপ্ত করিয়া পরে চাপ দিয়া। এরণ্ড বীজ, অনুত্তপ্ত অবস্থাতেই শতকরা ৩৬ ভাগ, তৈল প্রদান করে। প্রায় সিকি ভাগ বীজের খোসা বাদ গেলে বাকী অংশ তৈল পাওয়া যায়।

বীজ ও তৈল নিষ্কাসন

রেড়ীর তৈল বাহির করিবার জন্য বীজ উত্তপ্ত করা পন্থাটি আবার নানা ভাগে ভাগ করা হয়। কখনও বা সামান্য উত্তাপ দ্বারা, কখনও

বা খোলা হইতে শাঁস বাহির করিয়া সিদ্ধ করিয়া, কখনও বীজকে সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। বীজ ভাঙ্গিয়া সিদ্ধ করিবার সময় তৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। কখন বা এই প্রক্রিয়া দুইবারও পালন করা হয়।

বীজ গরম করিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, কারণ অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া গেলে তৈলের গুণ হ্রাস পায়। কখনও কখনও বীজের শীতল অবস্থায় প্রাপ্ত তৈল পুনরায় জলের সহিত ফুটাইয়া লওয়া হয়। ইহা দ্বারা তৈলের আঠাল বা চট্‌চটে অবস্থা এবং য়্যাল্‌বুমেন দুরীকৃত করা হয়। সাধারণতঃ বীজগুলি ভাঙ্গিয়া বস্তায় ভরিয়া চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হয়। আজকাল উন্নত প্রণালীর ফলে বীজ পেষণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে বীজের খোসা বর্ত্তমান থাকিলেও তৈলের পরিমাণ বা রঙের কোন তারতম্য হয় না। তৈল শোষণ করে না বলিয়া আবরণ-সমেত বীজ পেষণ করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে; ইহাতে বীজের শতকরা ৪৫ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায়।

ভারতে বাণিজ্য

ভারতে খুব পুরাতন চাষ হইলেও ঔষধার্থে যে তৈল ব্যবহৃত হইত তাহা পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমদানী করা হইত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ঔষধের জন্য রেড়ীর তৈলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে জ্যামেকা হইতে বিশ হাজার পাউণ্ডের উপর তৈল আমদানী করা হইয়াছে; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাহা কমিয়া সাড়ে তিন হাজার পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইতি মধ্যেই স্থির হয় যে ভারতে প্রাপ্ত তৈল ঔষধার্থেও বিশেষ উপযোগী এবং তখন হইতেই এক প্রকার আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নয় হাজার টাকা মূল্যের তৈল ভারত হইতে রপ্তানী হয়। ছয়

বৎসরের মধ্যেই তাহা বৃদ্ধি পাইয়া এক লক্ষ টাকার উপর চলিয়া যায়। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহা কিঞ্চিন্ন্যূন পঁচিশ লক্ষ টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে এক কোটী টাকার বীজ, খইল ও তৈল বিদেশে গিয়াছে; পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য।

জ্বালানী হিসাবে রেড়ীর তৈল বহুকাল প্রচলিত আছে। কেরোসিন, সরিষা, তিল প্রভৃতি তৈল অপেক্ষা কম পরিমাণ তৈলে

ব্যবহার

জ্বলে বলিয়া জ্বালানী হিসাবে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই রেড়ীর তৈলের প্রয়োজন। ইহাতে অপরাপর তৈল অপেক্ষা—একই শক্তির আলোতে—কম ধোঁয়া উৎপন্ন করে, দামে সস্তা এবং বিপদের আশঙ্কা কম বলিয়া এখনও ভারতবর্ষের রেল-কোম্পানী দ্বারা তাহাদের আলোতে বহুল ব্যবহৃত হয়। ইহার আলোক স্নিগ্ধ বা "ঠাণ্ডা" অর্থাৎ চক্ষের পীড়া উৎপাদক নয় বলিয়া অনেকে এই আলোক বিশেষ পছন্দ করেন।

যন্ত্রাদি তৈল নিষিক্ত রাখিতে রেড়ীর তৈলের বহুল প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহারের সহিত ইহার আদর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে জাতীয় lubricating oil সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বিশিষ্ট, তাহা রেড়ীর তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। যে সকল স্থলে অত্যধিক শৈত্যের জন্য অন্য

"ক্যাষ্টর অয়েল"

তৈল জমিয়া যায় এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সে সকল স্থলে "ক্যাষ্টর অয়েল" বহু সমাদর লাভ করিয়াছে। এ কারণে এরোপ্লেন বা বিমানপোতে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেলগাড়ীর চাকায় দিবার জন্য নাইট্রিক এসিডের সহিত ইহা মিলাইয়া লওয়া হয়।

চামড়া নরম রাখিবার জন্য এবং উহা বহুকাল স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে রেড়ীর তৈল ব্যবহৃত হয়।

কাপড়ে রং ধরাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার তৈলজাত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে। উহার বৈজ্ঞানিক নাম "Turkey red oil". তূলাজাত বস্ত্রে রঙ করিতে ও প্রস্তুত বস্ত্রের চাকচিক্য বৃদ্ধি করিতে অন্যান্য তৈল অপেক্ষা রেড়ীর তৈল বিশেষ উপযোগী।

"টার্কি রেড অয়েল"

সাবানের ব্যবসায়ে ইহার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল প্রকার সাবান প্রস্তুত করিতেই ইহা লাগে, বিশেষতঃ স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে রেড়ীর তৈল অপরিহার্য্য বলা চলে। ঔষধালয়ে Green sapo (soap) verdigris (copper-acetate : an astringent) করিতেও ইহার প্রয়োজন।

সাবান

মৃদু জোলাপ বলিয়া এই তৈলের বিশেষ খ্যাতি আছে এবং এই কারণে ইহা বহুদিন ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা ছাড়া লোমকূপ পরিষ্কার রাখিতে, কেশ নরম, উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখিতে এবং কেশের গোড়া দৃঢ় করিবার শক্তি আছে বলিয়া রেড়ীর তৈলের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে। নানারূপ সুগন্ধি তৈল, পোমেড প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্যও লাগিতেছে।

জোলাপ, কেশতৈল ও প্রসাধন

যাহারা অনেকক্ষণ জলে থাকিতে বাধ্য তাহারা ভেসেলিন (Vaseline) মাখে ; কিন্তু উহা সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পল্লীর দিকে পাওয়া যায় না ; অভাবে, লোক রেড়ীর তৈল মাখিয়া লয়। বর্ষার দিনে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে লোকে বাহিরে যাইবার সময় পায়ে বেশ করিয়া রেড়ীর তৈল মাখে।

জলরোধক শক্তি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রেড়ীর তৈল দেহের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক। সে কারণে স্বর্ণকারের প্রদীপে রেড়ীর তৈল ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকারেরা ফুকা দিয়া বর্ণহীন শিখা দ্বারা সোণা রূপার পান ও জোড়াই করিবার জন্য কাঠ কয়লার উপর যে অত্যুগ্র তাপ সৃষ্টি করে, তাহাতে রেড়ীর তৈলের প্রদীপ ব্যবহৃত হয়। শ্বাস দ্বারা তাহারা এই কার্য্য করে; এবং রেড়ীর তৈলের বাষ্প বা ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক নহে বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে এই তৈলই প্রশস্ত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার আলো ও তাপ পাইবার বিশেষ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণকারের কারখানায় এখনও রেড়ীর প্রদীপ সমানই সমাদর লাভ করিতেছে।

নির্দ্দোষ জ্বালানী তৈল

রেড়ীর খইলের প্রচুর ব্যবহার আছে। দাহ্য বলিয়া অনেকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। জ্বালানী বাষ্প (gas) পাইবার জন্য বীজ ও খইলের ব্যবহার আছে। এই বাষ্প কয়লার বাষ্প- (coal gas)এর ন্যায় সুন্দররূপে জ্বলে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার বিশেষ ক্ষমতা থাকায় সার হিসাবে ইহার সমাদর আছে। ধান ও আলু চাষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। ইক্ষু চাষে কেবল অস্থি চূর্ণের সার অপেক্ষা অস্থিচূর্ণ ও রেড়ীর খইল অনেকাংশে উপযোগী।

খইল—সার

পরিশিষ্ট

(ক)

(১৯৩৬-৩৭)

মোট জমি—১৪,০৫,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত— ৪,০৭,০০০ „ ২৯%

করদ রাজ্য— ৯,৯৮,০০০ „ ৭০%

মোট ফলন— ১,২৮,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত— ৪৮,০০০ „ ৩৭·৫%

করদ রাজ্য— ৮০,০০০ „ ৬২·৫%

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
মদ্র	২,৬৪	১৮·৯	২৫	১৯·৫
বোম্বাই	৪৬	৩·২	৬	৪·৭
বিহার	৩৩	২·৩	৫	৩·৯
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৩০	২·১	৬	৪·৭
উড়িষ্যা	২৫	১·৬	৩	২·৩
যুক্তপ্রদেশ	৯	·৬	৩	২·৩
করদ রাজ্য				
হায়দ্রাবাদ	৭৮,৮১	৫৫·৫	৬৬	৫১·৬
মহীশূর	১,০৩	৭·৩	৬	৪·৮
বরোদা	৬৮	৪·৭	৬	৪·৮
বোম্বাই করদরাজ্য	৪৬	৩·৬	২	১·৫

(গ)

রপ্তানী—পরিমাণ

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
বীজ—(টন)	৫৯,৯৬৮	৪৩,০৮৯	৪২,০৭৯
খইল— ”	১,৭০৪	১,৬৯৮	২,৫২৭
তৈল (গ্যালন)	১৪,০৮,০২২	১৫,১৪,৭২৮	১৫,৮৩,৫১৬

মূল্য—টাকা

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
	হাজার	হাজার	হাজার
বীজ—	৮৩,১৫	৬২,৯৮	৬৪,০৯
খইল—	৭২	৮৩	১,০২
তৈল—	২১,৪৭	২২,৯০	২৪,৬৬
মোট—	১,০৫,৩৪	৮৫,৯১	৮৯,৭৭

সর্ষপ বা সরিষা

(Colza, Rape, Mustard)

বাঙ্গালীর নিকট সরিষার পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাহারা যত সরিষা ব্যবহার করে, আর কোনও জাতি বোধ হয় এত করে না। সরিষার বাটনা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়, আর বাঙ্গালী তাহাই ব্যবহার করে বেশী। সরিষার তৈল মাখা বাঙ্গলা দেশে বিশেষ প্রচলিত। শিশু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সরিষার তৈলে সর্ব্বশরীর

ভিজাইয়া রৌদ্রে দিবার রীতি পল্লীর প্রায় প্রতি সংসারেই আছে। বয়োবৃদ্ধির সহিত সরিষার তৈলের ব্যবহার হ্রাস পায় না। প্রতিদিন স্নানে সরিষার তৈল মাখা হয় এবং কুস্তিগীর প্রভৃতি সকলে দেহে তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকে।

সরিষা, নানা নামে প্রচলিত আছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহাদের নামের পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা একই জাতীয়। বাঙ্গলাদেশে সরিষা, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ,—এই দুই প্রকারের পাওয়া যায়। ইংরাজীতে Indian Colza or Sarson (সিদ্ধার্থ বা শ্বেত রাই), Indian Rape or Tori, Lutni or Maghi (সরিষা) ও Indian mustard, rai, asl rai, etc. (রাজিকা বা রাই)—

জাতির বিভিন্নতা

এই সকলের যে সামান্য পার্থক্য আছে, তাহা Watt সাহেব নিজ পুস্তকে Colza বা সরিষা সম্বন্ধে Prain এর মতামত নিম্নলিখিতরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"It (colza) occurs in every province of Bengal except Chittagong, where it is replaced by a different mustard. It is easily distinguished from *Rai* by its stem clasping leaves, and from *Tori* by the greater amount of bloom on its foliage, by its taller stature, its more rigid habit, and its thicker plumper pods. When reaped, the seeds are distinguished by their usually white colour; when brown the seeds are distinguished readily from those of *Rai* by larger size and the smooth seed coat; from those of Tori by their being of a lighter brown, and by not having a paler spot at the base of the seed."

জমি তৈয়ারী করিয়া সরিষা দানা ছড়াইয়া দেওয়া হয় পরে দানা পুষ্ট হইলে গাছ কাটিয়া "খামারে" আনিয়া ফেলে এবং সরিষা পৃথক করিয়া লয়। তাহা ছাড়া গম প্রভৃতি অন্যান্য তণ্ডুলের সহিতও সরিষার চাষ করা হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশে এই মিশ্রিত চাষের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে।

চাষ

সেখানে তিন লক্ষ একর জমিতে যদি কেবল মাত্র সরিষার চাষ হয়, প্রায় তাহার আট গুণ জমিতে অন্যান্য ফসলের সহিত সরিষা রোপণ করা হইয়া থাকে। ভাদ্র আশ্বিনে বীজ রোপণ করিলে পৌষ হইতে ফাল্গুন মাস নাগাদ বীজ পুষ্ট হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্তপ্রদেশই সরিষা চাষের জন্য প্রধান; প্রায়

বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার চাষ

সমস্ত ফসলের অর্দ্ধেক এক যুক্তপ্রদেশেই পাওয়া যায়। পরে পঞ্চনদ, বাঙ্গলা এবং অন্যান্য প্রদেশের স্থান। করদ রাজ্যসমূহে সরিষার চাষ ভাল হয় না; পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

যুক্তপ্রদেশের মধ্যে বহ্‌রাইচ জেলার স্থান সরিষা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ; মথুরা, বুলন্দসর, সীতাপুর প্রভৃতি জেলাও উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চনদের মধ্যে লায়ালপুর, মুলতান, ডেরাগাজি খাঁ, ফিরোজপুর, সাহাপুর, হিসার জেলা; বাঙ্গলার মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া জেলা; বিহারের মধ্যে পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা; বোম্বায়ের মধ্যে উত্তর সিন্ধু সীমান্ত, নবাবসাহ প্রভৃতি জেলা; মধ্যপ্রদেশ ও বিরারের মধ্যে মুণ্ডলা, বিলাসপুর, জব্বলপুর এবং আসামের মধ্যে কামরূপ জেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সরিষার আদর তৈল ও খইলের জন্য। শ্বেত সর্ষপ হইতে ৩৬ হইতে ৪০ ভাগ এবং কৃষ্ণ সর্ষপ হইতে ২৮ হইতে ৩০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। এই দুই বস্তুরই নানারূপ ব্যবহার আছে।

বীজ, তৈল ও খইল মিলিয়া ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা; পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্য

ভারতের সরিষার প্রধান ক্রেতা ইংরাজ; তাহার অংশ প্রায় অর্দ্ধেক। ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, নেদারলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সরিষা রপ্তানী হইয়া থাকে; পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য। বীজের প্রধান বিক্রেতা সিন্ধু প্রদেশ; শতকরা ৯৮ ভাগ সেখান হইতে রপ্তানী হয়; পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য।

তৈলের প্রধান খরিদ্দার ব্রহ্মদেশ। মরিসস্, ফিজি প্রভৃতি সামান্যই লইয়া থাকে। খইলের রপ্তানীর প্রায় সবটাই সিংহলে যায়; জাপানও কিছু লইয়া থাকে; পরিশিষ্ট (ঙ) দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর মধ্যে বহু স্থানে সরিষার চাষ হয় না। চীন, জাপান, জার্ম্মাণী, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি কয়টি রাজ্যে সরিষার চাষ কিছু বেশী পরিমাণেই হইয়া থাকে। আর যেখানে যাহা হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে; পরিশিষ্ট (চ) দ্রষ্টব্য।

চূর্ণ সরিষা দ্বারা কোনও কোনও ভোজ্য সুস্বাদু করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রধানতঃ উহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। রন্ধন কার্য্যে ভাজা বা ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য তৈলের ব্যবহার প্রচুর। লোকে দেহে মাখে; ধাতব যন্ত্রের ঘর্ষণের কেন্দ্রগুলি তৈল নিষিক্ত রাখিতে, কোথাও বা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিতে সরিষার তৈল কাজে লাগে। ইস্পাতের পাত প্রস্তুত করিতেও সরিষার তৈলের প্রয়োজন আছে। ইহাতে সামান্য পরিমাণ গন্ধক থাকায়, দেহে মাখিলে দেহের কণ্ডূয়ন বা চুলকানি কমে।

ব্যবহার

ঔষধার্থে সরিষা ও তৈলের কয়েকটি ব্যবহার আছে। আফিম দ্বারা বিষাক্ত হইলে, সরিষার তৈলের প্রয়োজন। প্রত্যুগ্রতা

(counter irritation) সাধন করিবার জন্য সরিষার নানা রকম প্রলেপ বা plaster প্রয়োগ করা হয় এবং বিশুদ্ধ সরিষার তৈল পচন নিবারক বলিয়া খ্যাতি আছে। বেদনা যুক্তস্থানে রৌদ্রতপ্ত তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

খইলের ব্যবহার প্রধানতঃ দুইটি :—যথা, পশুখাদ্য ও সার। খইল আবার তৈলাক্ত হাত ও পাত্রাদি পরিষ্কার করিতে সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশ হিসাবে জমি ও ফলনের অংশ

(১৯৩৫-৩৬)

মোট জমি ৫৮,১৮,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত—	৫৭,২৮,০০০	”	৯৮·৫%
করদ রাজ্য—	৯০,০০০	”	১·৫%

মোট ফলন ৯,৭৬,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত—	৯,৬২,০০০	”	৯৮·৫%
করদ রাজ্য—	১৪,০০০	”	১·৪%

প্রদেশ	জমি হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
যুক্তপ্রদেশ *	২৭,৭০	৪৭·৫	৩,৯৮	৪০·৭
পঞ্চনদ	৯,৪৯	১৬·৪	১,৫৪	১৫·৭

* অপর শস্যের সহিত মিশ্রিত চাষের পরিমাণ একই সঙ্গে দেখান হইয়াছে।

প্রদেশ	জমি হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	৭,৪০	১২·৭	১,৮০	১৮·৪
বিহার	৫,৩৩	৯·১	১,২২	১২·৫
আসাম	৪,০১	৬·৮	৫৭	৫·৮
সিন্ধু	১,৩৯	২·৩	১৩	—
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৭২	১·২	১০	—
করদরাজ্যসমূহ	৯০	১·৫	১৪	১·৪

(খ)

রপ্তানী

পরিমাণ

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
বীজ (টন)	১৯,০২১	৩৭,৬৩৭	৩১,৯১৮
তৈল (গ্যালন)	২,৩৬, ৭৯৯	২,৫২,০০৭	৩,২৫,১১৭
খইল (টন)	২০,৬৩৮	৩০,৪৩৪	৩৬,৮৯১

মূল্য—টাকা

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
বীজ *	২৫,৭৮,৭৮২	৫৩,৬৭,৭৯২	৪৬,৪২,৭৪৪
তৈল	৩,৪৪,৫৩৩	৩,৯৪,৯০২	৪,০৩,৭২৮
খইল †	১৪,৪৭,৮৩৬	১৭,৯০,৬৯৪	২২,১১,৭৩৫
মোট-	৪৩,৭১,১৫১	৭৫.৫৩.৩৮৮	৭৩,৩৮,২০৭

* এই বীজ "Rape" বা "টোরি"র অঙ্ক। ইহা ছাড়া mustard বা রাই ২ লক্ষ টাকার উপর রপ্তানী হয়।

† তিল ও সরিষার খইলের পরিমাণ একই সঙ্গে দেখান হইয়াছে, সুতরাং সরিষার পরিমাণ নিশ্চিতভাবে জানিবার কোনও উপায় নাই।

(গ)

রপ্তানী—বীজের (Rape) ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	১৪,০৬৩	২০,০৯,২৮৯	৪৩·২
ইটালী	৫,৫১৯	৭,৮৩,৩৪৮	১৬·৮
বেলজিয়ম	৩,১৩৮	৪,৫৩,১৭৭	৯·৫
নেদারলণ্ড	২,৫৯৩	৪,৫১,০০৩	৯·৪

জার্ম্মাণী, মিসর, আমেরিকা ইত্যাদি।

Mustard or Rai

আন্দাজ সাড়ে চার লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে একা ফ্রান্স অর্দ্ধেকেরও বেশী ক্রয় করে।

(ঘ)

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
সিন্ধু	৩১,২৫৪	৪৪,৭৭,১০৪	৯৬·৪
বোম্বাই	৫৫৪	১,৪৯,২৪২	৩·২
মদ্র	১১৪	১৬,৩০৮	—
বাঙ্গলা	—	৯৬	—

(ঙ)

রপ্তানী—তৈলের ক্রেতা ও অংশ

	গ্যালন	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	১,৯৬,৮৮৪	২,৮১,৫০১	৫৮·৪
মরসিস্ দিঃ	৪৮,৫১৪	৭৩,২৬৪	১৫·০
ফিজিদ্বীপ	৩৭,০৭৩	৫৫,৫২৮	১১·৬
ব্রিটেন	৪,৪২২	৯,১৬৫	২·০

ইত্যাদি—

(চ)

পৃথিবীর ফলন

চীন	২৪,৫৩,২২০ টন
ভারতবর্ষ	৯.৭৬.০০০ ”
জাপান	১,২০,০০০ ”

জার্ম্মাণী, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ইত্যাদি।

(ছ)

পাঁচ বৎসরের জমি ও ফসলের পরিমাণ

	হাজার একর	হাজার টন
১৯৩২-৩৩	৬০,৯৪	১০,৪২
১৯৩৩-৩৪	৬০,৩৪	৯,৪৩
১৯৩৪-৩৫	৫৩,৩৮	৯,০০
১৯৩৫-৩৬	৫৩,৩৩	৯,৫৭
১৯৩৬-৩৭	৫৮,১৮	৯,৭৬

(জ)

প্রতি একরে গড়ে ফলন (পাউণ্ড)

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
বাঙ্গলা	৪৮২	৫৩০	৫৫৭	৪৯৫	৫৪৫
যুক্তপ্রদেশ	৩৯৫	৩২১	৩২৭	৪১৬	৩২২
পঞ্চনদ	২৯২	২৬৭	৩৩৬	৩৫৯	৩৬৩
সমগ্র ভারত (গড়ে)	৩৮৩	৩৫০	৩৭৮	৪০২	৩৭৬

তিল (Sesamum or Jinjili)

তিলের বিকার অর্থাৎ তিল হইতে নির্গত স্নেহ পদার্থই তৈল। এখন সকল প্রকার স্নেহকেই তৈল বলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজের উল্লেখ করা হয়, যথা—সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, এমন কি তিল তৈল পর্য্যন্ত বলা হয়।

ভারতবর্ষে তিলের পরিচয় অতি পুরাতন। হয়ত সেই আদিম যুগে একটি মাত্র তৈলদ বীজের সম্বন্ধে জানা ছিল বলিয়া, তিলকে হিন্দুর নানা ধর্ম্মকার্য্যের প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকার মধ্যে স্থান দেওয়া আছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, আফ্রিকা তিলের আদিম জন্মস্থান ; পরে কোনও সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; কিন্তু সেও আজ বহু দিনের কথা।

আদি চাষ

নানা প্রকার ফসলের মধ্যে তিল একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু

এবং এই কারণে ইহার বিশেষ হিসাব রাখা হয়। ভারতের নানাস্থানে

প্রদেশের চাষ

তিলের চাষ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মদ্র ও যুক্তপ্রদেশে খুব বেশী পরিমাণে ফলে। সরিষার ন্যায় তিল ও অন্যান্য ফসল, যথা জোয়ার, বাজরা বা তূলার সহিত মিলাইয়া চাষ করা হয়। যুক্তপ্রদেশে জমির পরিমাণ খুব বেশী হইলেও ফলনের পরিমাণ মদ্রে তদপেক্ষা অধিক। ভারতের সকল প্রদেশেই কমবেশী তিলের চাষ হইয়া থাকে। বোম্বাই ও বাঙ্গলার স্থান নিতান্ত মন্দ নহে; পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন জেলার হিসাবে দেখা যায়, বাঙ্গলায় ময়মনসিংহের স্থান

বিভিন্ন জেলার চাষ

প্রধান; সেখানে ১,৭৫,০০০ একর জমিতে তিল চাষ হয়। রঙ্গপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, বগুড়া, এই কয়টি জেলাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিহারে পালামৌ (৫৪,০০০ একর) সম্বলপুর ও উড়িষ্যায় অঙ্গুল; বোম্বায়ে আহম্মদাবাদ (৩৪,০০০ একর), বিজাপুর, করাচী; মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে হোসাঙ্গাবাদ (১,৩৪,০০০ একর), জব্বলপুর, সগর, নিমার, চন্দা, বিতুল, ছিন্দবারা প্রভৃতি; মদ্রে ভিজাগাপট্টম (১,২৭,০০০ একর), ত্রিচিনপল্লী, দক্ষিণ আর্কট, সালেম, উত্তর আর্কট, গঞ্জাম, অনন্তপুর, পশ্চিম গোদাবরী, মাদুরা প্রভৃতি জেলা; পঞ্চনদে গুরুদাসপুর (২৬,০০০ একর), মুলতান, কাঙ্গড়া এবং যুক্তপ্রদেশে হামিরপুর (১,৫৩,০০০ একর), ঝান্সী, বন্দা প্রভৃতি জেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীতে খুব বেশী স্থানে তিলের চাষ হয় না, সে কারণে

পৃথিবীর চাষ

ভারতের বিশেষ সুবিধা আছে। চীন, ভারতবর্ষ, তুরস্ক, সুদান, গ্রীস, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, পালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ হয়; পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।

চাষের কাল

ভারতবর্ষে তিল বপনের সময় দুইটি। এক, বর্ষার প্রথমে ও দ্বিতীয়, শীতকালে। তিল গাছ সাধারণতঃ দুই হাত পরিমাণ লম্বা হয়। ক্ষুদ্রতিল বা "কাটতিল" বাদে কৃষ্ণ, শুভ্র ও লোহিত বা রামতিল, এই তিন প্রকার তিল দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণতিলই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং ইহাতে তৈলের অংশও পরিমাণে অধিক।

বাঙ্গলার জমি

জমি হিসাবে বাঙ্গলায় তিলের ফলন অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। সারা ভারতের গড়ে একর-প্রতি ফলন যখন ১৯৫ পাউণ্ড, বাঙ্গলায় তখন ৪৯৯ পাউণ্ড পাওয়া যায়। বাঙ্গলার পরই বিহারে ফলনের হার বেশী, অর্থাৎ ৩৩১। মদ্র, উড়িষ্যা, বোম্বাই করদ রাজ্য সমূহে চাষের হার মন্দ নহে।

সরিষা হইতে ঘানি দ্বারা যেরূপভাবে তৈল নিষ্কাসিত করা হয়, সেইভাবে তিল হইতে তৈল পাওয়া যায়। সামান্য জল দ্বারা ভিজাইয়া ঘানির মধ্যে দিয়া পিষিয়া লইলে তৈল পাওয়ার সুবিধা হয়।

বাণিজ্য

তিলের বহির্ব্বাণিজ্য আছে। বীজ, তৈল ও খইল—সবই বাহিরে চালান যায়। তিলের চালানের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অংশ বোম্বাই হইতে যায়; পরেই বাঙ্গলার স্থান। ব্রহ্ম আমাদের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা। সিংহল, আরব, ইটালী প্রভৃতি দেশও তিল লয়। পরিশিষ্টে (গ) সমস্ত বিশদভাবে দেখান হইল। এডেন ও আরব আমাদের তিলের তৈল আমদানী করে; পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য। আর সরিষার খইলের সহিত তিলের খইল সিংহল, জাপান, মিসর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারতে এত তিল জন্মিলেও, কতক পরিমাণ তিল বাহির হইতে আসে এবং বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা; পরিশিষ্ট (ঙ) দ্রষ্টব্য।

তৈলের ব্যবহার থাকায় তিলের আদর। কাঁচা তিল লোকে নানা প্রকার মিষ্টান্নের সহিত মিলাইয়া খায়; বড়ি প্রভৃতিতে তিল দিলে বড় মুখরোচক হইয়া থাকে। "তিলকুটা", "গোলাপী রেউড়ী" প্রভৃতি তিল সংযোগে তৈয়ারী হইয়া থাকে।

ব্যবহার

তিল তৈল লোকে রন্ধনকার্য্যে লাগায়, কেশে মাখে এবং উহা হইতে নানা প্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করে। সাবান প্রস্তুত করিতে ইহার বহু প্রয়োজন। জ্বালানীরূপে, মার্জ্জারিণ প্রস্তুত করিতে, ঘৃতের ও অলিভ অয়েলের সহিত ভেজাল মিশাইতে, ধাতব পদার্থের ঘর্ষণ নিবারণ করিতে তিল তৈলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। রবারের অনুকরণে সমগুণসম্পন্ন যে সকল দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়, তাহার উপাদান হিসাবে তিল তৈল কাজে লাগে।

ঔষধার্থে প্রলেপ, মলম করিবার জন্য তিল তৈলের প্রয়োজন। অর্শরোগে, রক্তাতিসারে কাসরোগে, কটিস্নানে (Hip bath) তিল বা তৈল নানারূপে ব্যবহৃত হয়। কবিরাজী মতে তিল পুষ্টিকর, মূত্রবর্দ্ধক, রজঃনিঃসারক ও স্নিগ্ধকারক বলিয়া পরিচিত।

খইলের ব্যবহার পশুখাদ্য ও সারের হিসাবে, কিন্তু ইহা সরিষা ও রেড়ীর খইল অপেক্ষা কম গুণসম্পন্ন।

তিলে ৫০ ভাগ তৈল, ২২ ভাগ প্রোটিড, ১৮ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট, ও ৪ ভাগ মিউসিলেজ এবং তৈলে ৭০ ভাগ তরল চর্ব্বি পদার্থ থাকে।

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রদেশ হিসাবে চাষ ও ফলন

(১৯৩৬-৩৭)

মোট জমি— ৪১,০৪,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত— ২৯,৯০,০০০ " ৭২·৯%

করদরাজ্য— ১১,১৪,০০০ " ২৭·১%

মোট ফলন— ৪,৪৪,০০০ টন

ব্রিটিশ ভারত— ৩,৩৬,০০০ " ৭৮·৯%

করদরাজ্য— ১,০৪,০০০ " ২১·১%

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
যুক্তপ্রদেশ	১০,৬৮	২৫·২	১,০৯	২৪·৫
মদ্র	৮,০২	১৯·৫	১,০০	২২·৫
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৪,৩৫	১০·৬	৩৬	৮·১
বাঙ্গলা	১,৮৪	৪·৪	৪১	৯·২
বোম্বাই	১,২৭	৩·০	১৩	২·৯
বিহার	১,১৫	২·৮	১৭	৩·৮
উড়িষ্যা	১,১০	২·৬	১৩	২·৯
করদরাজ্য—				
হায়দ্রাবাদ	৫,৪৭	১৩·৩	৪১	৯·২
বোম্বাই	৩,৯৪	৯·৬	৫০	১১·২

পঞ্চনদ প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশেও কিছু কিছু চাষ হয়

(খ)

পৃথিবীর চাষ

চীন	৮,৮৫,৫৩০ টন
ভারতবর্ষ	৪,৪৪,০০০ ”
তুরস্ক	৩৯,০০০ ”
সুদান, গ্রীস ইত্যাদি।	

(গ)

রপ্তানী

পরিমাণ

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
বীজ (টন)	১,৩০০	১৪,২১৬	১০,১২৬
তৈল (গ্যালন)	১,৫০,০২৫	২,৮১,৪৪৯	২,৫১,৮২৭

মূল্য—টাকা

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
	২,৬৯,৮০৩	২৭,১৫,১১৭	১৯,১৮,২৮৯
তৈল	২,৪৫,৬৯১	৫,১০,৯৩৫	৩,৮৯,২৯৫

তিলের খইলের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হয় না, সরিষার খইলের সঙ্গে রপ্তানীর হিসাব দেখান আছে।

রপ্তানী—বীজের ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট—১৯,১৮,২৮৯ টাকা

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	৪,৬৪২	৮,১০,১৩৭	৪২·২
সিংহল	১,৯৭৪	৩,৪২,৩৫২	১৭·৯
আরব	৪৬৭	১,১৫,৬০৮	৬·০
ইটালী, ইত্যাদি—			

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
বোম্বাই	৪,৪৫৩	৯,৫১,৪৮০	৪৯·৫
বাঙ্গলা	৩,০৮২	৫,৪৫,৭৪১	২৮·৪
মদ্র	২,৫২৬	৪,০৬,৬৪২	২১·২
সিন্ধু	৬৫	১৪,৪২৬	·০৭

(ঘ)

রপ্তানী—তৈলের ক্রেতা ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট—৩,৮৯,২৯৫

	গ্যালন	মূল্য	শতকর অংশ
এডেন	১,০৯,৫৪৩	১,৫৯,৭৬৪	৪১·১
আরব	৬৩,১৯১	৯০,২৫৮	২৩·১
অন্যান্য	৭৮,৯৯৩	১,৩৯,২৭৩	

(ঙ)

আমদানী

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১৫৫	১৯,৪৯৩
১৯৩৬-৩৭	—	১৬৪
১৯৩৭-৩৮	৫৮৩	৮৯,৬৫২

(চ)

জমি ও ফলন

	হাজার একর	হাজার টন
১৯৩২-৩৩	৪৬,৫৬	৪,৮৬
১৯৩৩-৩৪	৪৬,৯৮	৪,৭৪
১৯৩৪-৩৫	৩৭,৯১	৩,৫২
১৯৩৫-৩৬	৪১,৩৫	৪,১৩
১৯৩৬-৩৭	৪১,০৪	৪,৪৪

(ছ)

প্রতি একরে গড়ে ফলন

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৭-৩৮
বাঙ্গলা	৫০১	৪৯৬	৪৯৬	৪৮৬	৪৯৯
যুক্তপ্রদেশ	২৪৩	২১৪	১৯৭	১৯৮	২২৯
মদ্র	৩০০	২৮৪	২৭১	২৫৯	২৭৯
সমগ্র ভারত গড়ে	২০২	১৯২	১৭৪	১৮৩	১৯৫

জীরা (Cummin)

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে জীরার যে কোনও স্থান আছে, এ কথা বলিলে হঠাৎ কেহ বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীরা ভারতের বাহিরে রপ্তানী হইয়া থাকে, অবশ্য পরিমাণ হিসাব করিতে গেলে খুব বেশী হইবে না।

জন্মস্থান ও চাষ

বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, মিসর বা ভূমধ্যসাগরের উপকূল এবং তথাকার দ্বীপপুঞ্জ, জীরা জন্মের প্রধান স্থান। মধ্যযুগে ইউরোপের নানাস্থানে, যথা ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে জীরার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পরে সা-জিরা আসিয়া উহার স্থান দখল করিয়া লয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদে অধিকমাত্রায় চাষ হইলেও, বাঙ্গলা ও আসাম বাদে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাষ হইয়া থাকে।

বাণিজ্য

ভারতের ফসলের পরিমাণের হিসাব রাখা হয় না, কারণ, ইহা তত প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া কেহ মনে করেন না। প্রধানতঃ বোম্বাই এবং বাঙ্গলাদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া সিংহল, ষ্ট্রেটস্ সেট্‌লমেণ্টস্, ব্রিটিশশাসিত পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে চালান যায়। ভারতের মধ্যে জব্বলপুর, গুর্জ্জর, রাটলাম ও মস্কট প্রভৃতি স্থানে জীরার কেনা-বেচা হইয়া থাকে।

ব্যবহার

মশলার জন্যই জীরার সমাদর। ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধ করিবার জন্য গৃহকর্ত্রীরা ইহাকে অশেষরূপে কাজে লাগাইয়া থাকেন। চাটনি, মোরব্বা প্রভৃতি বস্তুতে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার। ঔষধার্থে ইহার ফল, বীজ, তৈল সমস্তই কাজে লাগান হয়, ইহা বায়ুনাশক, সুগন্ধি, পাচক এবং ধারক। বোধ হয়,

"জৃ" অর্থাৎ জীর্ণ করা—এই ধাতু হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, গ্রহণী, উদরাধ্মান, অতিসার প্রভৃতি রোগে ফলদায়ক।

জীরা হইতে শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ তৈল পাওয়া যায়, ইংরাজিতে ইহাকে "essential" oil বা বায়ী তৈল বলা হয়। সুরাসার মিশ্রিত সুগন্ধি পানীয় প্রস্তুত করিতে এই জীরা তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ এই তৈলই সম্পূর্ণরূপে মশলার সুগন্ধ অবিকৃতভাবে ধারণ করে।

জীরা তৈলের শতকরা ৫৬ ভাগ Cuminol বা Cuminaldehyde আছে, তাহার গুণেই জীরা তৈলের আদর।

রপ্তানী—পরিমাণ ও মূল্য
(কৃষ্ণজীরা বাদে)

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১,২৬৫	৭,২৫,৯৫২
১৯৩৬-৩৭	৮০৬	৪,১১,৬৫৭
১৯৩৭-৩৮	১,১৬২	৫,৭৯,০৯৬

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

পরিমাণ—টন

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
বোম্বাই	১,০৭৯	৯৫০	৪২৮
সিন্ধু	১০৫	২৮৮	৩৬১
বাঙ্গলা	২৭	২১	১২

১৯৩৭-৩৮ সালের বিভিন্ন প্রদেশের অঙ্ক পাওয়া যায় নাই।

মূল্য—টাকা

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
বোম্বাই	৬,৩৪,৩২৩	৫,৬৫,৮৫৫	২,৩১,৪৪৩
সিন্ধু	৫৭,১১৫	১,৪৭,৪৪১	১,৭৩,৫৯৫
বাঙ্গলা	১১,০২০	১১,৩২৩	৪,৬৬৪
মদ্র		১৩৩	১,৮৯৫

রপ্তানী—কৃষ্ণজিরা

সাল	টাকা
১৯৩৪-৩৫	১৩,২৭২
১৯৩৫-৩৬	১১,৪৮১
১৯৩৬-৩৭	২৭,৪৪৩

ধনিয়া বা ধনে (Coriander)

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ধনিয়ার একটু সামান্য স্থান আছে, তাহাতে ভারতের রপ্তানীর হিসাব নিতান্ত বৃদ্ধি না পাইলেও কোনও কোনও দেশ ভারত হইতে ধনিয়া ক্রয় করে।

বহুকাল হইতেই ধনিয়া নানা দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে এককালে মিসরে ধনিয়া চালান যাইত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কেহ কেহ মনে করেন ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বদেশ বা লিভাণ্টের নিকট কোনও স্থানে ধনিয়ার প্রথম চাষ হয়; পরে তাহা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের প্রায় সকল স্থানেই ইহার চাষ হইয়া

ইতিহাস ও চাষ

থাকে। কিন্তু রুশ, হাঙ্গেরী, হল্যাণ্ড, মরোক্কো প্রভৃতি স্থানে প্রচুর চাষ হয় এবং গুণ হিসাবে রুশ ও মোরাভিয়ার বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ভারতের নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে ধনিয়া রোপণ করা হয় এবং সাধারণতঃ অপর কোনও শস্যের সহিত মিশাইয়া চাষ করা হয়। সচরাচর যুক্তপ্রদেশে শীতকালে; বোম্বায়ে বর্ষায় এবং মদ্রে হেমন্তে, ধনিয়া চাষ আরম্ভ হয়; পঞ্চনদে কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল নাই।

তৈল ও ব্যবহার

ধনিয়া হইতে এক প্রকার বায়ী তৈল নিষ্কাসিত হইয়া থাকে; এই তৈলই ইহার গন্ধ ও স্বাদের আধার। স্নায়ুশূল, উদরাধ্মান ও বাত প্রভৃতি রোগে ঔষাধার্থে ধনিয়ার তৈল লাগে। ভারতবর্ষের বীজ হইতে প্রাপ্ত তৈলের পরিমাণ নিতান্ত কম বলিয়া ইহা ক্বচিৎ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপে বহুকাল হইতেই মশলারূপে ধনিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষেও ব্যঞ্জনাদি রন্ধনকার্য্যে প্রচুর ধনিয়া লাগে। আচার, মোরব্বা এবং মদ্যজাতীয় পানীয়ে সুগন্ধদান করিতে ধনিয়া বা ধনিয়ার তৈল বিশেষ কাজে লাগে। ইহা পিত্ত ও বায়ুনাশক, অগ্নি-উদ্দীপক ও উত্তেজক। জ্বরাদি রোগজনিত তৃষ্ণায় চিনি ও মধুসহ ধনের ক্বাথ বিশেষ উপকারী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে খ্যাতি আছে।

ধনিয়ার পাতা লোকে শাক ও তরকারী হিসাবে ব্যবহার করে। কোনও কোনও বেদনাতে যবচূর্ণের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়।

বাণিজ্য

ধনিয়ার কিছু রপ্তানী আছে; তাহার অধিকাংশ বাঙ্গলা ও মদ্র হইতে সিংহল ও ষ্ট্রেটস্ সেট্‌লমেণ্টস্ প্রভৃতি দেশে যায়। নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে কয় বৎসরের রপ্তানীর হিসাব পাওয়া যাইবে:—

রপ্তানী—পরিমাণ ও মূল্য

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৪,০৯২	৬,১৭,৩৩৫
১৯৩৬-৩৭	৪,৮৮৪	৬,৪২,৬৭০
১৯৩৭-৩৮	৬,১৫১	৯,২৭,৮৯৩

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

(১৯৩৬-৩৭)

	টাকা	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	২,৭৫,০৪৫	৪২·৭
মদ্র	১,৮৯,২২৮	২৯৩
সিন্ধু	১,২৬,৩৩৫	১৯·৫

ক্রেতাগণের নাম ও অংশ

(১৯৩৬-৩৭)

	টাকা	শতকরা অংশ
সিংহল	২,৩৮,৩৩২	৩৭·০
ষ্ট্রেটস্ সেটল্‌মেণ্টস	২,০৯,০৯৭	৩২·৫
যবদ্বীপ	৭২,১২৮	১১·১
ইউনিয়ন অফ্ সাউথ আফ্রিকা	২৭,৫৯৭	৪·৩
মলয়	১৮,১৩২	২·৯
কেনায়া, মরিসস্ ইত্যাদি		

মেথী (Fenugreek)

ভারতের পণ্যতালিকায় মেথীর যে স্থান আছে, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না, কিন্তু অন্যান্য বায়ী তৈলযুক্ত (essential oil seed) বীজের মধ্যে মেথীর স্থান অনেক উপরে। ভারতীয় পণ্যের খাতায় "বিবিধ" বলিয়া যে সকল বীজ পরিচিত আছে, তাহার পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা ; তন্মধ্যে মেথী একাই উহার একতীয়াংশ ভাগ অধিকার করিয়া আছে।

কাশ্মীর, পঞ্চনদ, বোম্বাই, মদ্র প্রভৃতি স্থানে প্রচুর মেথী জন্মে। সমুদ্র হইতে দূরে উচ্চ ভূমিতে, গঙ্গার তীরে সমতলক্ষেত্রে মেথী চাষ করিলে

চাষ

ফসলের পরিমাণ নিতান্ত কম হয় না। কোনও স্থানে পৌষ-মাঘ আবার কোথাও বা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিয়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়। এই গাছগুলি ওষধি জাতীয়, প্রতি বৎসরই ফলদান করিয়া মরিয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মেথীর বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে, প্রতি বৎসরই প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বীজ রপ্তানী হইয়া

বাণিজ্য

ইংলণ্ড, সিংহল প্রভৃতি দেশে যায়। এই রপ্তানীর প্রায় সমস্তটাই বোম্বাই লাভ করে ; বাঙ্গলার অংশ ইহাতে সামান্যই আছে এবং অন্যান্য প্রদেশের কিছুই নাই।

মেথীর বীজে এক প্রকার রঙ আছে, হাতে ঘসিলেও পীত রঙ হাতে লাগে। মেথীর স্বাদ কতকটা তিক্ত বলিয়া লোকে আহার্য্যের জন্য তত ব্যবহার করে না, কিন্তু ইহার সুগন্ধের জন্য এবং ঔষধিগুণসম্পন্ন

ব্যবহার

বলিয়া বীজের সমাদর আছে। আমাদের দেশে মাছ ধরিবার সুগন্ধি মশলা, স্ত্রীলোকদের "মাথাঘষা" এবং তৈলের সুগন্ধি উপকরণ করিবার জন্য মেথীর

প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা স্নিগ্ধকারক, রজোনিঃসারক, মূত্রবর্দ্ধক ও নিঃসারক, বল্য, সঙ্কোচক ও বায়ুনাশক। প্রদাহগ্রস্ত স্থানে স্বেদ বা সেঁক দিবার জন্য, ক্ষুধামান্দ্যের সহিত অজীর্ণরোগে, সূতিকাবস্থার উদরাময়ে, পুরাতন কাস ও প্লীহা ও যকৃৎ-বিবর্দ্ধন রোগে এবং হাম ও বসন্ত রোগে শরীর স্নিগ্ধ করিবার জন্য মেথী নানা আকারে ব্যবহৃত হয়।

মেথীর গাছ গবাদি পশুর খাদ্যরূপে প্রচলিত আছে।

রপ্তানী—পরিমাণ ও মূল্য

সাল	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	২,১৮৮	৩,৮৬,৫০৪
১৯৩৫-৩৬	১,৪১৪	২,৮৭,৫৭২
১৯৩৬-৩৭	১,৭১৪	৩,৪২,৮৯০

ক্রেতার অংশ

(১৯৩৬-৩৭)

	টাকা	শতকরা অংশ
সিংহল	১,৩৩,২১৫	৩৮·৭
ব্রিটেন	১,৩২,২৫৩	৩৮·৪
ষ্ট্রেটস্ সেট্‌লমেণ্টস্	৪৫,৩২০	১৩·১
আমেরিকা	২,৪৫৭	·৮

দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুদান প্রভৃতি-

বিক্রেতার অংশ

(১৯৩৬-৩৭)

বোম্বাই	৩,৩৮,০২৮৲	টাকা
বাঙ্গলা	৪,২৭০৲	”

সোরগুজা বা কালাতিল

(Niger seed)

সরিষার তৈলে ঝাঁজ বৃদ্ধি করিবার জন্য সোরগুজা, সজিনার ছাল প্রভৃতি মিশান হয়, এইরূপ প্রচলিত মত আছে। যাঁহারা ব্যবসায়ী, তাঁহারা এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা বলিতে পারেন। তাহা ছাড়াও ইহার নানারূপ ব্যবহার আছে এবং রপ্তানীও আছে।

ভারতবর্ষে ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্য, মদ্রের উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশে সোরগুজা চাষ হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন আফ্রিকা ইহার জন্মস্থান।

সাধারণতঃ আষাঢ়-শ্রাবণে রোপণ করিলে অগ্রহায়ণ-পৌষ নাগাদ ফল পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার স্বতন্ত্র চাষ হইলেও অনেক সময় অপর ফসলের সহিত মিশাইয়া চাষ করিতে দেখা যায়। মিশ্রিত চাষ সচরাচর বসন্তকালে আরম্ভ করা হয়।

বীজের ওজনের প্রায় ৩৫% তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকাংশে ইহা তিল তৈলের মত। শরীরে মাখিবার জন্য এবং রন্ধনাদি কার্য্যে এই তৈল বহুল ব্যবহৃত হয়। তিল ও অন্যান্য মূল্যবান তৈলের ভেজালরূপেও কতক তৈল কাজে লাগে। ইহা কার্পাস ও তিসি তৈলের সমগুণসম্পন্ন অর্থাৎ বাতাসে শীঘ্র শুকাইয়া যায়, সেই কারণে রঙের জন্য প্রয়োজন হয়। ধাতব পদার্থের ঘর্ষণ নিবারণের জন্য এবং জ্বালানীরূপেও ইহার ব্যবহার আছে। ইহা দামে খুব সস্তা বলিয়া ভেজালের জন্য বিশেষ সুবিধা হয়। সাবান (soft soap) প্রস্তুত করিতেও কেহ কেহ ব্যবহার করেন।

তৈল—ব্যবহার

সোরগুজার খইল পশুখাদ্যরূপে বহু সমাদর লাভ করে; অনেকে মনে করেন ইহা অপরাপর নানাপ্রকার খইল অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

পল্লীর দিকে গবাদি পশুর হাড়ে বেদনা হইলে, হাড় সরিয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে ঔষধরূপে সোরগুজার প্রলেপ বা সেঁক দেওয়া হইয়া থাকে।

এখনও সোরগুজা বিদেশে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। কোনও বৎসর অপেক্ষাকৃত বেশী রপ্তানী হইলেও হয়ত পরবৎসরই তাহা হঠাৎ হ্রাস পাইতে পারে।

বীজের প্রধান খরিদ্দার জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, আমেরিকা, নেদারলণ্ড, ফরাসী ইত্যাদি। আন্দাজ তিন লক্ষ টাকার রপ্তানীর মধ্যে জার্ম্মাণী প্রায় এক লক্ষ টাকার মাল লয়। এই ব্যবসায়ে বাঙ্গলার কোনও স্থান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; মদ্রই সমগ্র রপ্তানীর শতকরা ৯৭ ভাগ অধিকার করে।

রপ্তানী—পরিমাণ ও মূল্য

	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	১,৫৮৯	১,৪০,৫৩৪
১৯৩৫-৩৬	১,৯৯৯	২,৪২,৭১২
১৯৩৬-৩৭	২,৪২৭	২,৯৫,৯২৪

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

পরিমাণ—টন

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
মদ্র	১,৪১৩	১,৬৫৩	২,৩৭৭
বোম্বাই	১৭৩	৩৪৬	৪১
বাঙ্গলা	৩	—	৯

মূল্য—টাকা

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	শতকরা অংশ
মদ্র	১,১৫,০৭৯	১,৮৭,৭৮০	২,৮৮,০৬৩	৯৭
বোম্বাই	২৪,৮৪৭	৫৪,৮৯২	৬,৫৭৪	২
বাঙ্গলা	৫৮১	৪০	১,২৮৭	

ক্রেতাগণের নাম ও অংশ

(১৯৩৬-৩৭)

	টাকা	শতকরা অংশ
জার্ম্মাণী	৯৬,০৮৭	৩২·০
ব্রিটেন	৫৭,৭২৯	১৯·৩
বেলজিয়ম	৪৫,৯৫২	১৯·৩
আমেরিকা	৪১,৪১৫	১৩·৭
নেদারলণ্ড	৩৯,৪৩৯	১৩·০
ফ্রান্স	১১,৯২৩	৪·০

যমানি বা যোয়ান (Ajawan)

মানুষের জীবনে যোয়ানের খুব বেশী ব্যবহার নাই, সুতরাং লোকে ইহার সবিশেষ বিবরণ কিছুই রাখে না; কিন্তু যোয়ানেরও রপ্তানী আছে।

প্রধানতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে যোয়ান রোপণ করা হয়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাষ হইলেও বাঙ্গলাই ইহার প্রধান কেন্দ্র। মিসর, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশেও যোয়ান চাষ হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে ইহার চাষের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

চাষ

ইংলণ্ডকে বাদ দিলে বাহিরে ভারতের যোয়ান বিশেষ কোথাও রপ্তানী হয় না; যাহা হয়, তাহার পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। বাঙ্গলায় চাষ বেশী হইলেও রপ্তানীর অধিকাংশই বোম্বাই বন্দর হইতে হয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যোয়ানের রপ্তানীর পরিমাণ দশ হাজার হন্দর ছিল; যুদ্ধের সময় তাহা তেরো হাজার হন্দর হইলেও এখন মাত্র এক হাজার হন্দরে দাঁড়াইয়াছে।

বাণিজ্য

পানের মশলায় যোয়ানের ব্যবহার খুব বেশী; ব্যঞ্জনের মশলা রূপেও, বিশেষতঃ ফোড়নে, কেহ কেহ ব্যবহার করেন। ঔষধার্থে যোয়ানের চাহিদা আছে। বীজ সিদ্ধ বা চোলাই করিয়া যোয়ানের জল বা যোয়ানের আরক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উত্তর ভারতে উহা বিক্রীত হয়। জীর্ণ যোয়ান বা লেবুর রস ও বিট্ লবণ দ্বারা জারিত যোয়ান এবং যোয়ানের বড়িও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা পাচক, বায়ুপ্রশমক, আক্ষেপ ও পচন নিবারক। আমবাত রোগে গুড় সহ কেহ কেহ খাইতে দেন। বাত রোগে যমানি তৈল হিতকর। আক্ষেপ-নিবারক বলিয়া উদরাধ্মান, শূলবেদনা, মূত্ররোধ রোগে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ গৃহস্থও উদরাময় রোগে যোয়ানের আরক সেবন করে।

ব্যবহার

তৈল বাহির করিয়া লইবার পর যে যোয়ান পড়িয়া থাকে, তাহা পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে; কিন্তু ভারতবর্ষে এ বিষয়ে কেহ মনোযোগ দেন না, সুতরাং প্রায় সমস্তটাই নষ্ট হইয়া যায়।

ইহাতে একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত বায়ী তৈল এবং থাইমল নামক পদার্থ আছে। বীজের শতকরা মাত্র তিন ভাগ বা চার ভাগ জোয়ানের তৈল হয়। এই তৈল চোলাই করিবার সময় ইহার উপর ক্ষুদ্রাকার দানাদার পদার্থ ভাসিয়া উঠে। ইহাকে সাধারণতঃ "যোয়ানের ফুল" বলা হয়। থাইমল নিষ্কাসনের সময় সুগন্ধি পদার্থ থাইমিন্‌ও পাওয়া যায়। সাবানে সুগন্ধদান করিবার জন্য থাইমিনের ব্যবহার আছে। পচননিবারক ও বীজাণুনাশক বলিয়া থাইমল কাজে লাগে। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর ভারতের কোনও কোনও স্থানে থাইমল প্রস্তুত করা হয় এবং ইহারও রপ্তানী আছে, কিন্তু পরিমাণ নিতান্ত সামান্য বলিলেও চলে।

"যোয়ানের ফুল",—থাইমল

রপ্তানী (যোয়ান)

	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	৫১	৯,৮১০
১৯৩৫-৩৬	৬২	১১,৭৬০
১৯৩৬-৩৭	৪৮	৯,৬৭৩

১৯৩৬-৩৭ সালে ইংলণ্ড ৭,৫৭৫৲ টাকার মাল লইয়াছে এবং বোম্বাই বন্দর হইতে ৮,০৮৬৲ এবং বাঙ্গলা হইতে ১,৫৮৭৲ টাকার মাল গিয়াছে।

সোলফা বা সুল্‌ফা (Sawa or Dill)

সোলফা একটি অবজ্ঞাত পদার্থ; সাধারণতঃ কোনও কোনও গৃহস্থ ব্যঞ্জনাদিতে গন্ধ করিবার জন্য পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাও আবার উগ্র বলিয়া অনেকেই পছন্দ করেন না। বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলে ইহার ব্যবহার খুব বেশী।

ভারতের বহু স্থানেই সোলফা চাষ হইয়া থাকে; শাক ছাড়াও বীজের প্রয়োজনীতা আছে এবং এই বীজের জন্যই ভারতের পণ্য-তালিকায় সোলফা স্থান পাইয়াছে। প্রতি বৎসরই লক্ষাধিক টাকার

চাষও বাণিজ্য

সোলফা-বীজ রপ্তানী হয় এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা ইহার প্রধান ক্রেতা। বোম্বাই হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বাঙ্গলা হইতে অনেক বেশী, অথবা বোম্বাইকে একমাত্র বিক্রেতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বীজের আদর সোলফার বায়ী-তৈলের জন্য। ইহা হইতে

তৈল

শতকরা তিন বা চার ভাগ সুগন্ধযুক্ত বায়ী-তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ঔষধার্থে এবং সাবান সুগন্ধযুক্ত করিবার কাজে লাগিয়া থাকে। ব্যঞ্জনাদিতে সামান্য ব্যবহার আছে।

১৯৩৭-৩৮ সালের রপ্তানীর পরিমাণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই; তৎপূর্ব্ব তিন বৎসরের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	৯৭৪	১,৪৭,৩০০
১৯৩৫-৩৬	৬৪৪	১,০৮,৬৪০
১৯৩৬-৩৭	৫৬৭	৯৬,০৪৩

১৯৩৬-৩৭ সালের ক্রেতাগণের মধ্যে ইংলণ্ড ৪৯,৩৫৭ ও আমেরিকা ২৫,৫৯০ টাকার মাল লইয়াছে। তন্মধ্যে বোম্বাই বন্দর হইতে ৯৫,৬৩১ এবং বাঙ্গলা হইতে ৪১২ টাকার সোলফা বীজ রপ্তানী হইয়াছে।

রাঁধুনী (Ajmot or Ajama)

ব্যঞ্জনাদির মশলা ব্যতীত রাঁধুনীর সহিত কাহারও বিশেষ কোনই পরিচয় নাই। ঔষধার্থে, পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক ও উত্তেজক বলিয়া ইহার সামান্য ব্যবহার আছে। ভারতের সর্ব্বত্রই অল্লাধিক চাষ হইয়া থাকে। বায়ী তৈলের জন্য ইহার রপ্তানী আছে এবং ভারতের পণ্যের হিসাবের মধ্যে বায়ী তৈলবীজের তালিকায় প্রতি বৎসরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

রপ্তানীর প্রায় সমস্তই বোম্বাই হইতে হয় এবং এদেন, ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেণ্টস্ প্রভৃতি স্থানে যায়। ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাব পাওয়া যায় নাই, পূর্ব্ব তিন বৎসরের অঙ্ক নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	৮২	২৪,৮৭৭
১৯৩৫-৩৬	৯৯	৩৩,৩৯৯
১৯৩৬-৩৭	৯৫	২৩,৮৬৬

পোস্ত (Poppy Seed)

পোস্ত সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আফিমের আলোচনা করা প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া তাহা

স্বতন্ত্র বিভাগে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, আফিমের ইতিহাস, কৃষি, বাণিজ্য ও ব্যবহার হইতে পোস্তদানার পরিচয় সর্ব্বাংশেই ভিন্ন! সুতরাং একের সহিত অপরটি বৃক্ষের উপর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইলেও, প্রবন্ধের মধ্যে একই স্থানে দেওয়া অযৌক্তিক। পোস্ত-বৃক্ষের যে ফল হয়, তাহা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া দিলে যে আঠা বাহির হইয়া যায়, তাহাই আফিম, আর ফলের মধ্যে যে দানা থাকিয়া যায়, তাহাই পোস্ত। যে সকল ফল হইতে আফিম বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই, তাহার দানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পোস্ত ও আফিম

পণ্ডিতেরা মনে করেন, আফিমের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বেই লোকে পোস্তদানার ব্যবহার জানিত। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের পুস্তকে পোস্তদানার গাছ বাগানে শোভা বিস্তারের জন্য রোপণ করা হইত। ইংরেজী poppy গাছ এখনও সৌখীন লোকে বাগানে লাগাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা আকারে সর্ব্বরকমে আফিম গাছের সহিত একরূপ হইলেও, তাহা আফিম গাছ হইতে ভিন্ন।

ইতিহাস

পোস্তগাছ ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব উপকূলের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করা হয়। বর্ত্তমানে ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে আফিম পাইবার আশায় লোকে চাষ করিয়া থাকে। বাঙ্গলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আশ্বিন মাসে গাছ রোপণ করা হয়। আড়াই হইতে তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষে ফুল ও পরে ফল আসে। যুক্তপ্রদেশে এবং পঞ্চনদে প্রায় সমস্ত চাষই হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সমস্ত জমির নব্বই ভাগ যুক্তপ্রদেশে আছে।

ইতিহাস ও চাষ

যে-সকল ফল বা ঢেঁড়ী হইতে আফিম বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই, এরূপ ফলের পোস্তবীজ অধিকমাত্রায় সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং তৈলযুক্ত। ব্যঞ্জনরূপে এবং বড়ি ও বড়া প্রভৃতি মুখরোচক পদার্থ প্রস্তুত করিতে লোক পোস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। পোস্ত হইতে এক প্রকার তৈল বাহির করা যায় এবং উত্তর ফ্রান্সে এই তৈলের জন্য প্রচুর পোস্ত চাষ হইয়া থাকে। ইহা ঐ প্রদেশের একটি বিশেষ ব্যবসায় এবং অনেক লোকে ইহার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। জার্ম্মাণী, ব্যাভেরিয়া উর্‌টেমবার্গ এবং বেডেন প্রদেশেও পোস্ত-তৈল সংক্রান্ত শিল্প প্রচলিত আছে।

তৈল—ব্যবহার

ভারতবর্ষে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা রন্ধনকার্য্যে লাগে; ইহা সদ্গন্ধযুক্ত। কেহ কেহ জ্বালানীরূপে বা ধাতব পদার্থের ঘর্ষণ নিরোধ করিতে ব্যবহার করে। সাবান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইলেও ইহার পরিমাণ খুব বেশী নহে। কিন্তু চিত্রকরের ব্যবহারের জন্য রঙের তৈল প্রস্তুত করিতে ইহার বিশেষ সমাদর এবং পণ্ডিতদের মতে এই কার্য্যের জন্য অন্য কোনও তৈলই ইহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণতঃ ইহা শীঘ্র আঠাল বা বা চটচটে হইয়া যায় না, এবং সেই কারণেই ইহার ব্যবহার বেশী।

বীজের শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। শ্বেত বীজ হইতে অধিক গুণ-সম্পন্ন তৈল প্রস্তুত হইলেও কৃষ্ণবীজ হইতে বীজের ওজনের তুলনায় অধিক পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়। বীজ বাহির করিবার পর খইল পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। দানার স্বাদ খইলে অনেক পরিমাণ থাকে বলিয়া ইহা পশুদের অতীব প্রিয়।

বীজ ও তৈল

ভারত হইতে পোস্তদানার রপ্তানী আছে এবং বর্ত্তমানে ইংরাজই প্রধান খরিদ্দার। ১৯৩৩-৩৪ সাল অবধি ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী, নেদারলণ্ড এবং ফ্রান্স প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকার উপর পোস্তবীজ লইত। ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকা সাড়ে চার হাজার টাকার বীজ লইয়াছে। ইহারা এখন আর কেহ লয় না। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকার রপ্তানীর মধ্যে ইংলণ্ড আন্দাজ সাত হাজার টাকার মাল লইয়াছে। গত চার বৎসরের রপ্তানীর হিসাব ঃ—

বাণিজ্য

	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	৭৫	১৭,৮৮৬
১৯৩৫-৩৬	৩৯	১৩,০৬৩
১৯৩৬-৩৭	৫২	১৩,৮৪৯
১৯৩৭-৩৮	১১১	৩৩,৭৩০

রপ্তানীর অধিকাংশই বোম্বাই বন্দর হইতে চলিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অল্প পরিমাণই কলিকাতা হইতে বাহিরে যায়।

মৌরি বা মিঠাজিরা (Aniseed)

মৌরি বা মিঠাজিরা মিসর এবং গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সাইপ্রাস, ক্রীট প্রভৃতি স্থানে প্রথম জন্মলাভ করে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পারস্য ভেদ করিয়া উত্তর ভারতে প্রবেশলাভ করিয়া এখন ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে স্পেন, জার্ম্মাণী, ইটালী, রুশ, মাল্টা, সীরিয়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হইয়া থাকে। স্পেন দেশে আলিকান্টে প্রদেশের বীজ পৃথিবীর

পৃথিবীর চাষ

মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই বৃক্ষ ওষধিবিশেষ; প্রতি বৎসরই ফলদান করিয়া মরিয়া যায়।

মৌরি চোলাই করিয়া এক প্রকার আরক পাওয়া যায়। "মৌরির জল" নামে সুগন্ধি, ভারতীয়দের অতিশয় প্রিয় বস্তু। ঔষধ এবং মশলারূপে মৌরি খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। চাটনী, মোরব্বায় মৌরির একান্ত প্রয়োজন এবং বিশেষ বিশেষ মদ্যে মৌরির আরক ব্যবহৃত হয়। ইটালীতে মৌরির জল বা আরক স্নিগ্ধকর পানীয়ে পরিণত করে। ইহা আগ্নেয় ও উত্তেজক এবং বায়ু, কাসি, শ্লেষ্মা ও বমন নিবারক; উদরাধ্মান ও শূলাদি রোগেও ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার

সিংহল, ভারতীয় মৌরীর প্রধান খরিদ্দার; মোট রপ্তানীর এক-তৃতীয়াংশ সিংহলে চালান যায়। বিক্রেতার মধ্যে বোম্বাই প্রায় এক চেটিয়া স্থান অধিকার করিয়া আছে; অতি সামান্যই বাঙ্গলাদেশ হইতে যায়।

নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে:—

	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	২৫	৬,৯৬৪
১৯৩৫-৩৬	২৮	৫,৭৭৯
১৯৩৬-৩৭	৫৮	৯,১১৯

১৯৩৬-৩৭ সালে বোম্বায়ের রপ্তানীর পরিমাণ ৮,৯৬৭ টাকা এবং সিংহলের অংশ ৩,২৭১ টাকা।

পানমৌরী বা মাধুরিকা (Fennel)

ইহার সহিত বিশেষ পরিচয় কাহারও নাই, কিন্তু পণ্য হিসাবে ইহা অন্যান্য অনেক তৈলবীজ অপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

কোনও কোনও গাছ একবার জন্মিয়া কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকে এবং তিন চার হাত দীর্ঘ হয়। ইহা ভারতবর্ষের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। শীতের চাষ হিসাবে বাঙ্গলা, যুক্ত প্রদেশ এবং বোম্বাই প্রদেশে দেখা যায়। এক স্থানে জন্মিলে প্রতি বৎসরই দানা পড়িয়া পুনরায় নূতন গাছ হইয়া থাকে। সমতলক্ষেত্রে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এবং পার্ব্বত্য স্থানে চৈত্র বৈশাখে বীজ রোপণ করা প্রশস্ত।

ইউরোপে নানা স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে, তাহা সত্ত্বেও বায়ী তৈলের জন্য যে বীজ ব্যবহৃত হয় তাহা মাণ্টা হইতে আমদানী করে।

ইহার নির্য্যাস ভারতবর্ষে মৌরীর আরক বা "আরক বদিয়ান" বলিয়া পরিচিত। এই বীজ হইতে শতকরা তিন ভাগ বায়ী তৈল পাওয়া যায় এবং এই তৈলে এ্যানিথল (anethol) এবং মৌরী-কর্পূর (anise camphor) আছে। ইউরোপে নানারূপ মুখরোচক ভোজ্য প্রস্তুত করিতে বা মৌরীর জল করিতে ব্যবহৃত হয়। বীজ এবং তৈল উত্তেজক, জীর্ণকারক এবং সুগন্ধদায়ক বলিয়া নানারূপ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক প্রকার বিশেষ যৌগিক সুগন্ধি (Synthetic hawthorn perfumes) প্রস্তুত করিবার জন্য 'আবেপাইন' ('aubepine') পাইতে হইলে মৌরীর নির্য্যাস একান্ত প্রয়োজন। ইহার মূল, মল-নিঃসারক বা জোলাপের কার্য্য করে। মোরব্বা, চাটনী

ব্যবহার

প্রস্তুত করিতে এবং ম্যাকারোনি (macaroni) নামক ভোজ্য প্রস্তুত করিতে, ইটালীর অধিবাসীরা অনেক মৌরী কাজে লাগায়।

এই জাতীয় মৌরীর যে ব্যবহারই থাকুক, ভারত হইতে ইহার রপ্তানীর পরিমাণ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে সওয়া দুই লক্ষ টাকা এবং তৎপর বৎসর প্রায় দুই লক্ষ টাকার মৌরী রপ্তানী হইয়াছে। ইহার প্রধান ক্রেতা সিংহল এবং পরে আমেরিকা। বোম্বাই প্রদেশ হইতে ইহা অধিক মাত্রায় রপ্তানী হইয়া থাকে।

বাণিজ্য

	টন	টাকা
১৯৩৪-৩৫	৫৬২	১,৫০,৭৪৬
১৯৩৫-৩৬	৭০৩	২,২৪,৮৫৬
১৯৩৬-৩৭	৬৮৮	১,৮১,৪৭৩

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৬-৩৭)

	টাকা	শতকরা অংশ
সিংহল	৬৮,৮০৮	৩৭.৮
আমেরিকা	২৫,৬৩৫	১৪.৩
ষ্ট্রেট্‌স সেট্‌লমেণ্টস্‌	১৫,০৫৭	—
ফ্রান্স	১৪,৬৩০	—
সুইডেন	১৩,৫২৮	—
অন্যান্য	—	—

বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৬-৩৭)

	টাকা	শতকরা অংশ
বোম্বাই	১,৪৭,১৬১	৮০
বাঙ্গলা	৩১,২১৮	১৭
মদ্র	৩,৫০৪	—

মহুয়া বীজ (Mowa or Mowrah)

পণ্যের বাজারে মহুয়া বীজের কোনও নির্দ্ধারিত স্থান নাই। প্রতি বৎসরই ইহার রপ্তানীর পরিমাণে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু ইহার রপ্তানী এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।

জাতির বিভিন্নতা

মহুয়ার গাছ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম উপকূলস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে এক জাতীয় বৃক্ষ পাওয়া যায়। ইহারা বৎসরে একবার সম্পূর্ণ-রূপে পত্রশূন্য হইয়া যায়। বোম্বাই এবং বাঙ্গলা বন্দর হইতে প্রধানতঃ এই বৃক্ষের বীজই রপ্তানী হইয়া থাকে। হায়দ্রাবাদ এবং মদ্রে যে গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রথমোক্ত বৃক্ষ হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। তৃতীয় প্রকার বৃক্ষ হিমালয়ের পাদদেশে উচ্চভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও এক জাতীয় মহুয়া গাছ আছে।

কিন্তু মহুয়ার বীজ বা ফল সম্বন্ধে বলিবার সময় এই পার্থক্য রাখা হয় না। বিদেশী বণিকদিগের গ্রন্থে মহুয়ার উল্লেখ পাওয়া না গেলেও পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে মহুয়ার স্থান আছে। পরে মুসলমান

বাদশাহগণের নির্দ্দেশে লিখিত ভারতীয় নানা বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্পের বিবরণের মধ্যেও মহুয়ার কথা বিশেষভাবেই উল্লিখিত আছে।

মহুয়া গাছ দরিদ্রের বন্ধু। অনেকে ইহার ফুল খাইয়া থাকে; ইহা হইতে প্রস্তুত মাদক অনেকের আনন্দদানের সহিত জীবনরক্ষার সুযোগ করিয়া দেয়। মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ইহার নূতন পত্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং চৈত্র বৈশাখ নাগাদ পুষ্পের গুচ্ছ দেখা দেয়। ফুল পুষ্ট হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় অধিবাসীরা বৃক্ষতলের আবর্জ্জনা দূর করিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দেয় এবং ফুল পড়িতে আরম্ভ করিলে প্রতি সকালে আসিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। প্রতি বৃক্ষ হইতে দুই হইতে চার মণ পর্য্যন্ত ফুল পাওয়া যায়। ফুল এক স্থানে জমা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়; তখন ভাত বা অন্য ভোজ্যের সহিত ইহা সাধারণ লোকে ভক্ষণ করে। শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেও ফুল অনেকে খায়— বিশেষতঃ ইহা বালক-বালিকাদের প্রিয় খাদ্য। শুষ্ক ফুল সিদ্ধ করিয়া বা ভাজিয়া খাওয়ার রীতি আছে। যখন অন্য খাদ্য যোগান কঠিন হইয়া পড়ে, তখন লোকে কেবলমাত্র মহুয়ার ফুল খাইয়া জীবন ধারণ করে।

ফুল আহরণ

ব্যবহার—ফুল

মহুয়ার ফুলের অন্য ব্যবহার রহিয়াছে; ইহা হইতে সস্তা মাদক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে মহুয়ার মদ্যের প্রচলন রহিয়াছে; ইহার মিষ্ট স্বাদ ও গন্ধের জন্য বিশেষ সমাদর। অন্য নানা জাতীয় মাদক-উৎপাদক দ্রব্যাদি হইতে পরিমাণের তুলনায় মহুয়া হইতে বেশী মদ্য পাওয়া যায়। ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্থ নর-নারী, এমন কি অপেক্ষাকৃত স্বল্পবয়স্কের মধ্যেও মহুয়ার মদ্যপান প্রচলিত আছে।

সাধারণতঃ অধিকাংশ বৃক্ষেরই ফুল এবং ফল দুইই সমান পরিমাণ কাজে লাগে না—ফুল নষ্ট হইয়া প্রয়োজনীয় বীজ দান করিয়া থাকে।

বীজ

মহুয়ার ফুলের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; বীজেরও প্রভূত ব্যবহার রহিয়াছে এবং সেই কারণেই ভারতের পণ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

এই বীজ হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায় এবং ইহা শীঘ্র জমিয়া যায় বলিয়া ইহা "ঘৃত" বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই তৈল অতিশয় উপাদেয়; ভোজ্য তৈল হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ঔষধের জন্য মলম বা প্রলেপ তৈয়ারী হয় এবং জ্বালানীর

"ঘৃত"

কাজে লাগান হয়। কোথাও কোথাও এই তৈল হইতে সাবান এবং বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। জার্ম্মাণী এই উদ্দেশ্যে মহুয়া তৈল আমদানী করিত। গাছের ছাল উঠাইয়া দিলে যে আঠা বাহির হয়, তাহা হইতে নানারূপ দ্রব্যাদি

অন্যান্য ব্যবহার

প্রস্তুত হইতে পারে। ছাল হইতে রঙ হইয়া থাকে। মহুয়ার খইল সাররূপে কাজে লাগান যায়; আহারে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া পশুখাদ্যরূপে অব্যবহার্য্য।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, মহুয়া বৃক্ষের সংখ্যা দেশে আরও বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন; দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে মহুয়ার ফুল ও তৈল প্রাণরক্ষা করিতে নিশ্চয়ই সহায়তা করিবে। অনাবৃষ্টিতেও এই গাছের কোনও ক্ষতি হয় না।

জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, নেদরলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় সকল দেশই

বাণিজ্য

ইহার খরিদ্দার ছিল; কিন্তু ফরাসী বন্দর সমূহে মহুয়ার বীজ আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতের ব্যবসায়ীদের সমূহ ক্ষতি হইয়া যায়। এখন যে পরিমাণ বীজের রপ্তানী

আছে, তাহা উপেক্ষণীয়। কিন্তু নূতন দেশ অনুসন্ধান করিলে হয় ত নূতন ক্রেতা আবিষ্কার করা কঠিন নহে।

গত তিন বৎসরের হিসাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ১৫০৲ টাকা, ১৯৩৬-৩৭ সালে ১০৲ টাকা এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪,৪৯৩৲ টাকার মহুয়া বীজ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

চালমুগরা (Chaulmoogra)

এককালে চালমুগরা বীজের রপ্তানী ছিল, কিন্তু এখন পণ্যের তালিকা হইতে নাম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কোনও সময়ে আবার হয়ত সুদিন ফিরিতে পারে।

বহুকাল হইতেই চালমুগরার তৈল চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে এবং সেই কারণে ইহার সমাদর অনেক। ভারতীয় চালমুগরা হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা ফলপ্রদ তৈল, অনুরূপ এক বৃক্ষের বীজ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার চাহিদা হ্রাস পাইতেছে।

চট্টগ্রাম, আসাম ও ব্রহ্মের নানা অংশে এই মহীরুহ জন্মিয়া থাকে এবং দুই বৎসর অন্তর ইহার বীজ সংগৃহীত হয়। ইহার বীজ অত্যন্ত নরম, এমন কি বীজের শাঁস হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলে, তৈল বাহির হয়। প্রধানতঃ এই শাঁস ছাঁচিয়া লইয়া ক্যাম্বিশ জাতীয় দৃঢ় বস্ত্রের মধ্যে ভরা হয়; পরে উপর হইতে চাপ দিতে দিতে তৈল বাহির হইতে থাকে। এই তৈল স্বচ্ছ, এবং সামান্য হরিদ্রাভ; ইহাতে একটি সুগন্ধ আছে।

তৈল নিষ্কাসন

ভারতীয় চালমুগরার তৈল Taraklogenous Kurzii হইতে

পাওয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, প্রকৃত চালমুগরা পাইতে হইলে Hydnocarpus Wightianaর প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এই বৃক্ষ মারোতি নামে পরিচিত। ইহা আফ্রিকা দেশে প্রচুর জন্মে এবং তাহা জমি, জল ও হাওয়ার গুণে বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া আজকাল চালমুগরা তৈল বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে।

জমির বিভিন্নতা

কঠিন চর্ম্মরোগ, এমন কি কুষ্ঠরোগেও চালমুগরার তৈল বিশেষ উপকারী এবং এখন প্রায় সর্ব্বস্থানেই চর্ম্মরোগের জন্য ইহা দ্বারা নানারূপ প্রলেপ তৈয়ারী হইয়া থাকে।

ভাঙ্গ বা সিদ্ধিবীজ (Hempseed)

হিসাব মত ভাঙ্গবীজ ভারতের পণ্য-তালিকার মধ্যে নগণ্য-অর্থাৎ বহির্ব্বাণিজ্যে কোনও স্থান নাই বলিলেও চলে; কিন্তু ইহার নানারূপ ব্যবহার আছে বলিয়া ইহার উল্লেখ প্রয়োজন।

ভাঙ্গ ও সিদ্ধি সম্বন্ধে অন্যস্থানে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইবে। সিদ্ধিবীজ লোকে অন্য আহার্য্য বা পানীয়ের সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করে। বীজ চূর্ণ করিয়া বা বাটিয়া জলের সহিত মিলাইয়া অতিথিকে দিবার রীতি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কোথাও বা চূর্ণ করিয়া অন্যান্য তণ্ডুলচূর্ণের সহিত স্বল্পমাত্রায় মিলাইয়া ভোজন করে। মাদক ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য কোথাও বা মদ্যের সহিত মিশান হয়। পালিত পক্ষীর এবং দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য হিসাবে বীজের ব্যবহার আছে।

পুরাতন ব্যবহার

বীজ হইতে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে পাইলে ইহাতে রঙ এবং পালিশ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা বায়ুতে শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া এই কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। ইহা কোথাও বা জ্বালানী তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়। সাবান, বিশেষতঃ soft soap, করিতে হইলে এই তৈল প্রয়োজন।

আধুনিক ব্যবহার

১৯৩৬-৩৭ সালে রুশে দু'লক্ষ আটাশ হাজার টন, মাঞ্চুরিয়ায় ছচল্লিশ হাজার টন, রুমানিয়ায় তেইশ হাজার টন, পোলণ্ডে উনিশ হাজার টন ভাঙ্গ-বীজ সংগৃহীত হয়। ইহা ছাড়া চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী, জার্ম্মাণী বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশেও ভাঙ্গবীজ সংগৃহীত হইয়াছিল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ইহা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়।

পৃথিবীর চাষ

চা-বীজ (Tea Seed)

চা লইয়াই লোক ব্যস্ত, চায়ের বীজের খবর রাখিবার সময় নাই। সাধারণ লোক খবর রাখুক আর নাই রাখুক, যাহাদের প্রয়োজন, তাহারা ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য চা-আবাদের দেশ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ চা হয়, সে তুলনায় পণ্যের বাজারে চা-বীজের কিছুই চাহিদা নাই। কার্পাস-বীজ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা অনেকটা চা-বীজে প্রযোজ্য। কিন্তু কার্পাস-বীজের বহুল ব্যবহার থাকায় জগতের পণ্যের বাজারে তাহার হিসাব রাখা হয়, চা-বীজের সে সমাদর নাই।

চা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য যথাস্থানে বিবৃত হইবে। সংক্ষেপে বলা যায় ভারতবর্ষে, ব্রিটিশ-ভারত ও করদরাজ্য মিলিয়া প্রায় সাড়ে আট লক্ষ একর জমিতে চা আবাদ হইয়া থাকে এবং উহা হইতে চল্লিশ কোটি পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। তুলা এবং তুলা-বীজের অনুপাত জানা আছে, কিন্তু চা সম্বন্ধে সেরূপ হিসাব নাই।

চাষ

আসাম এবং বাঙ্গলা দেশেই প্রচুর চা জন্মে। উপরন্তু ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে মদ্র এবং করদরাজ্যের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও ত্রিপুরার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চা বীজ সম্বন্ধে বিশদ হিসাব রাখা হয় না, সুতরাং বলা যায় না, চা-বীজের রপ্তানী কোথা হইতে বেশী হইয়া থাকে। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধিকাংশ বীজই এদেশে নষ্ট হইয়া যায়। যতদিন না আমরা প্রতি জিনিষের সকল অংশের সম্যক ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারি, ততদিন আমরা আমাদের প্রতিপক্ষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিব. না। যাহারা চা-বীজের ব্যবহার জানে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে চা বিক্রয় করিতে পারে।

অপব্যবহার

চা-বীজে শতকরা কুড়ি ভাগ তৈল পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে সাধারণভাবে ঐ বীজ হইতে জ্বালানী তৈল এবং সাবান প্রস্তুতের উপাদান পাওয়া যায়। আরও কি কি গুপ্ত ব্যবহার আছে বা ভবিষ্যতে কি হইবে, সে সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতে না বলিয়া দিলে আমাদের জানিবার উপায় নাই।

তৈলের ব্যবহার

সার হিসাবে চা-বীজের খইল রেড়ী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাতে নাইট্রোজেনের ভাগ প্রায় আধাআধি এবং খনিজ পদার্থ বা ফস্ফেট

(phosphate) হিসাবে রেড়ীর তুলনায় কিছুই নাই বলিলেই চলে।

খইল

এই খইল জীবদেহে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া পশুখাদ্যরূপে অচল; কিন্তু ইহা সিদ্ধ করিয়া যে ক্বাথ পাওয়া যায়, তাহা ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গাদির নাশের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভারত হইতে এখনও চা-বীজের রপ্তানী আছে; নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে তাহা পাওয়া যাইবে:—

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১২	৬৭,৩০৩
১৯৩৬-৩৭	১৭	৭৭,০১২
১৯৩৭-৩৮	১০	২০,০৮২

হঠাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকার রপ্তানী ১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৩৭-৩৮ সালে কেন কমিল, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক

বাণিজ্য

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এইভাবে আমাদের পণ্যের বাজার ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমাদের প্রবল চেষ্টা হওয়া উচিত, যাহাতে আমাদের "বাজার" ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া না যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীর চেষ্টা করা প্রয়োজন, যাহাতে নূতন বাজার আবিষ্কৃত হয়।

আমাদের বাজার অপরে দখল করিয়া লইতেছে, আমরা মূক

প্রতিদ্বন্দ্বী

হইয়া তাহা দেখিতেছি। ১৯৩৭ সালে সাতচল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড তৈল কেবল হংকঙ হইতে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে এক আমেরিকাই সওয়া আটাশ লক্ষ পাউণ্ড তৈল লইয়াছে। সুতরাং ভারতের পণ্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

বিবিধ তৈল

চন্দন—কাষ্ঠ ও তৈল
(Sandal wood & oil)

ভারতের পণ্য তালিকায় চন্দনের কাষ্ঠ এবং তৈল দুই বস্তুরই স্থান আছে এবং প্রকৃতপক্ষে পুস্তকের দুই বিভিন্নস্থানে ইহাদের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লেখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে উহাতে অসুবিধা হইবে বলিয়া এইস্থানেই সমস্ত বিষয়টার আলোচনা করা গেল।

ভারতের অতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে চন্দনের উল্লেখ আছে। এবং শ্বেত, পীত ও লোহিত এই তিন প্রকার চন্দনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। বহুকাল হইতেই চন্দন কাষ্ঠ পণ্যরূপে ক্রয় বিক্রয়াদি হইত এবং আরবের ব্যবসায়ীরা চন্দনকাষ্ঠ ও তৈল মিসর ও ইউরোপীয় দেশসমূহে বাণিজ্যের জন্য লইয়া যাইত।

বিভিন্নতা

বর্ত্তমানে মহীশূর রাজ্যই চন্দনের প্রধান প্রাপ্তিস্থান। পৃথিবীর সমস্ত চন্দনকাঠের শতকরা ৮৮ ভাগ এক মহীশূর হইতেই পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে মহীশূর বাদে কুর্গ, মদ্রপ্রদেশে কইম্বাটুর ও সালেম এবং করদরাজ্য সমূহের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর এবং সন্দুরেই চন্দন গাছ জন্মিয়া থাকে। মহীশূর ও কুর্গে সমস্ত চন্দন গাছই রাজসম্পত্তি; অপর কোনও অধিবাসীর চন্দনের গাছ নাই। মদ্রেও সাধারণ লোকের অধিকার থাকিলেও প্রায় সমস্ত গাছই সরকারী বাগানে বা জঙ্গলেই হইয়া

পণ্যের চন্দন

থাকে। বৎসরের শেষভাগে ঐ তিন স্থানের কাঠ এক এক স্থানে জমা করিয়া সরকারী নিলামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চন্দন গাছগুলি চির হরিৎ। Royal Botanical Gardens এর Curator, John Scott এর মতে চন্দন অপর বৃক্ষের পরগাছা রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ক্রমে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে শতাধিক ভিন্ন গাছের মূলের নিকট চন্দনের পরগাছা জন্মিতে পারে। আমরা যে চন্দন কাষ্ঠ দেখিতে পাই তাহা চন্দন বৃক্ষের অন্তরের সার

কাষ্ঠ

ভাগ; উপরের অংশ বিশেষ সুগন্ধযুক্ত নহে। এই অসার অংশের ওজন প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ। দশ বৎসরে মোটামুটী আট হইতে দশ ইঞ্চি পরিধির বৃক্ষ হয় এবং ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসরে মৃত্তিকা হইতে সাড়ে চার ফুট উপরে বাণিজ্যের উপযোগী আন্দাজ বত্রিশ ইঞ্চি পরিধির কাঠ পাওয়া যায়।

ভারতের বাজারে প্রতি বৎসর আড়াই হইতে তিন হাজার টন পর্য্যন্ত চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয়ের জন্য হাজির হয়। ইহার আমদানী ও রপ্তানী দুইই আছে কিন্তু চন্দনের তৈলের আমদানী নাই বলিলেও

বাণিজ্য

চলে। কাষ্ঠের রপ্তানীর পরিমাণ দশ লক্ষ টাকার উপর এবং আমদানী কমবেশ পঞ্চাশ হাজার টাকা। পণ্যের খাতায় চন্দন তৈলকে বায়ী বা উদ্বায়ী তৈল বলা আছে এবং এক লক্ষ বিশ হাজার পাউণ্ডের মূল প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা দেওয়া আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের চন্দন কাষ্ঠের ক্রেতাদিগের মধ্যে জার্ম্মাণী, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সই প্রধান ছিল। জার্ম্মাণী শতকরা ৪৩·৪ ভাগ লইত; নেদারলণ্ড, সিংহল, মিসর ও জাপান সকলেই সামান্য পরিমাণ ক্রয় করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকা আমাদের চন্দন কাষ্ঠের এক মাত্র ক্রেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয়

না ; অর্থাৎ রপ্তানীর তিনভাগের দুই ভাগ একা সেইই লইয়া থাকে। জাপানও শতকরা প্রায় সাত ভাগ লইয়া থাকে। পরিশিষ্ট (ক) হইতে সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে।

তৈলের ক্রেতা মাত্র ব্রিটেন ও জাপান বলিলেও চলে। ব্রিটেনের অংশ শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ এবং জাপানের ১২ আর যাহারা লয়, তাহাদের অংশ নিতান্ত কম। বিক্রেতার মধ্যে বোম্বাই প্রায় এক চেটিয়া স্থান অধিকার করে ; মদ্রের অংশ মাত্র ২০%। পরিশিষ্টে (খ) প্রত্যেকের অংশ দেওয়া হইল।

আমাদের দেশে আমদানী করা কাষ্ঠের প্রধান বিক্রেতা, অষ্ট্রেলিয়া, পরে কেনায়া ও ষ্ট্রেট্‌স সেট্‌লমেণ্টস। ইহার অধিকাংশই বোম্বায়ে চলিয়া যায়, আর বাকী শতকরা ২০ ভাগ যায় ব্রহ্মে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে তৈল ও কাষ্ঠের রপ্তানী খুব বেশী ছিল এখন তাহা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কেবল কাঠ চালান যাইত এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের, এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে কমবেশ ছিয়াত্তর হাজার পাউণ্ডে। তৈলও যাইত, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই (১৯১৮-১৯), দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড মূল্যের, আর বর্ত্তমানে (১৯৩৭-৩৮) তাহা দাঁড়াইয়াছে, এক লক্ষ চার হাজার পাউণ্ডে।

পৃথিবীর কয়েকস্থানে চন্দনের কাঠ পাওয়া যায় এবং ভারতের কাঠ তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। ১৯৩৭-৩৮ সালে সরকারী হিসাবে আমদানী কাঠের টন ২৭২৲ টাকা গিয়াছে, আর রপ্তানীর কাঠ ১০০৬৲ টাকা টন পড়িয়াছে। এই দামের দরুণ আমাদের দেশে কাঠের আমদানী হয় এবং সাধারণ লোকে সস্তায় কাঠ কিনিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে।

কাষ্ঠের মূল্য

এই কাষ্ঠ ও তৈলের প্রধান অংশ মহীশূর হইতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সমস্ত চন্দন কাঠ পাওয়া গেলেও কনোজে প্রায় সমস্ত তৈলই প্রস্তুত হইত। লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানেও এই তৈল চোলাই হইত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ প্রদেশের শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়া এখন মহীশূর প্রভৃতি স্থানে আধুনিক কারখানায় তৈল তৈয়ারী হইতেছে। পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের বহ্‌রাইচ জেলায় চন্দনের গাছ দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু তৈল পাইবার জন্য যে কাঠ ব্যবহৃত হইত, তাহা সমস্তই মহীশূর বা মলবার হইতে আনীত হইত। এখন ঐ সকল স্থানের চন্দন গাছ লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে।

কাষ্ঠ ও তৈল

চন্দন কাঠ গুঁড়া করিয়া আটচল্লিশ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিবার পরে তাহা বদ্ধ তামার পাত্রে ভরিয়া তাপ দ্বারা চোলাই করিয়া ভিন্নপাত্রে ঐ জল ধরিয়া লওয়া হয়। বাষ্পীভূত জলের সহিত দ্বিতীয় পাত্রে তৈল গিয়া জমা হয় এবং জলের উপর ভাসিতে থাকে; তখন ঐ তৈল উপর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। আন্দাজ এক মণ কাঠ হইতে আড়াই হইতে সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত তৈল উদ্ধার করা অসম্ভব নহে।

তৈল নিষ্কাসন

১৯১৫ সালে বাঙ্গালোরে চন্দন-তৈল-নিষ্কাসনের জন্য কারখানা প্রথম চালু হয় এবং এই কারখানা হইতে প্রাপ্ত তৈল রপ্তানী হইতে থাকে। কিন্তু ইউরোপের বাজারে বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা হেতু এই কারখানায় ব্যবহৃত কাষ্ঠের পরিমাণের কোনও স্থিরতা না থাকায়, মহীশূর সরকার কাষ্ঠ বিক্রয়ের অসুবিধা ভোগ করিতে থাকে। পরে তাহারা নিজেই বাঙ্গালোরে একটি ছোট কারখানা খোলে। তৈলের চাহিদা বৃদ্ধির

কারখানা

সঙ্গে মহীশূর সহরেই আর একটী বড় কারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৩১ সালে পূর্ব্ব কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। চন্দন কাষ্ঠের ন্যায়, মহীশূর, পৃথিবীর প্রয়োজনের শতকরা আশী ভাগের উপর চন্দনের তৈল সরবরাহ করিয়া থাকে। অন্যান্য অনেক তৈল অপেক্ষা এই তৈল গন্ধে ও গুণে শ্রেষ্ঠ।

ব্যবহার

চন্দন কাষ্ঠ স্বাদে তিক্ত এবং অত্যন্ত কঠিন, পালিশ করিলে ইহাতে সুন্দর পালিশ হয়। ইহাতে হাত বাক্স, পাখা, ছবির ফ্রেম এবং সূক্ষ্ম খোদাই করা নানারকম সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্রাদি তৈয়ারী হইয়া থাকে। দেবার্চ্চনা ও সুগন্ধি প্রস্তুত করিতে চন্দন কাষ্ঠ লাগে। ধনীরা অনেক সময় আত্মীয়ের দাহকার্য্য ইহাদ্বারা সমাধা করেন। চন্দন ঘষিয়া প্রলেপ তৈয়ারী হইয়া থাকে, অনেকে তাহা প্রসাধনের জন্য দেহে মাখিয়া থাকেন।

ঔষধার্থে চন্দনের বহুল ব্যবহার। আয়ুর্ব্বেদে ইহার যত গুণের উল্লেখ আছে, প্রকৃতপক্ষে ততগুণ আছে বলিয়া আজ আর অনেকে স্বীকার করিবেন না। ইহা স্নিগ্ধ, মৃদু উত্তেজক, বিষঘ্ন (স্পর্শ-সংক্রামক পীড়ানাশক), জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বলিয়া প্রকাশ আছে। পিত্তবৃদ্ধি, শ্বাস ও হৃদযন্ত্রের রোগে এবং মসূরিকায় নানা আকারে চন্দন কার্য্যকরী। মাথাধরা, চর্ম্মরোগে এবং নানা প্রকার উদ্ভেদে প্রদাহস্থানে বাহ্য প্রয়োগ করা হয়। প্রবল জ্বরে কপালে দিলে স্বস্তিবোধ হয়। দারুণ তৃষ্ণায় চূর্ণ চন্দন, ডাবের জলের সহিত পান করিতে দিবার বিধি আছে। রক্তোৎকাসে, কবিরাজে রক্তচন্দন অন্যান্য অনুপানের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। "চোখ উঠিলে" কাষ্ঠ ঘসিয়া চোখের পাতার উপর

দেওয়া হয় এবং British Pharmacopœaতে কম্পাউণ্ড টিঞ্চার অফ ল্যাভেণ্ডারের রঙ করিতে ও কবিরাজি মতে কতকগুলি তৈল প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সুগন্ধের জন্যই তৈলের বিশেষ সমাদর, ইহার মিষ্ট গন্ধের সহিত আর কাহারও তুলনা হয় না। অনেক সুগন্ধি এসেন্স আতর প্রভৃতিতে এবং উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে তৈলের ব্যবহার আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে খাঁটী চন্দন-তৈলের গুণের বিবরণ পাওয়া যায় এবং অনেক রোগে ইহার ব্যবহারও দেখা যায়।

ভারতবর্ষে নানা প্রয়োজনে পাঁচ হইতে ছয় শত টন চন্দনের তৈল লাগে এবং ইহার প্রায় সমস্তই এই দেশে তৈয়ারী হইয়া থাকে।

(ক)

রপ্তানী—কাষ্ঠ

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৮৬২	৯,২৫,৩৪১
১৯৩৬-৩৭	৮৪৫	৯,৮৬,৯৫৮
১৯৩৭-৩৮	১,০০২	১০,০৮,৮৬৭

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
আমেরিকা	৫৮৮	৫,৯৫,৭১৫	৫৯·০
জাপান	৬৬	৬৫,৫৬০	৬·৪
ব্রিটেন	২২	২৪,০৩০	২·৩
অন্যান্য	৩২৬	৩,২৩,৫৬২	—

(খ)

রপ্তানী—তৈল

	পাউণ্ড	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১,০২,০৭১	১১,০৯,৮৮৮
১৯৩৬-৩৭	১,২৪,৬১৯	১৪,১২,৬৭৭
১৯৩৭-৩৮	১,১৯,৬৩৪	১৩,৮৬,২১৬

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	পাউণ্ড	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৮৫,২৭৫	১০,৩৬,০৬৩	৭৪·৭
জাপান	১৪,৫৮০	১,৬৪,৯৩৫	১১·৮
অন্যান্য	১৯,৭৭৯	১,৮৫,২১৮	—
মোট	১,১৯,৬৩৪	১৩,৮৬,২১৬	

প্রদেশ হিসাবে বিক্রেতার অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	পাউণ্ড	টাকা	শতকরা অংশ
বোম্বাই	৯৫,০২১	১১,১৬,৫২৩	৮০·৫
মদ্র	২৪,২৭৫	২,৬৬,৪৪৪	১৯·০
বাঙ্গলা	৩৩৮	৩,২৪৯	—

(গ)

আমদানী—কাষ্ঠ

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	২১৩	৭৪,৬৬৪
১৯৩৬-৩৭	৩০৯	৯৭,৪৪৭
১৯৩৭-৩৮	১৪২	৩৮,৬৭৮

গন্ধবেণা বা ভূস্তৃণ তৈল

(Palmarosa oil)

আজও এই বিজ্ঞানের যুগে গন্ধবেণার ন্যায় অকিঞ্চৎকর বস্তু ভারতের পণ্য তালিকায় স্থান অধিকার করিয়া আছে। রপ্তানীর পরিমাণ অবশ্য বেশী নহে, কিন্তু ভারতীয় বহু পণ্য লোপ পাইয়াছে, সেই হিসাবে গন্ধবেণার নিশ্চয়ই এমন কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে, যাহাতে বিদেশীরা ইহাকে ভোলে নাই। সেখানে ইহা নানা নামে পরিচিত হইয়া আছে ; যথা,—ভারতীয় তৃণজাত তৈল (Indian grass oil), নিমার তৈল (Nimar oil), Palmarosa oil ইত্যাদি।

এই তৃণের নানা জাতি আছে ; কিন্তু প্রধানতঃ পণ্যের পরিচয়ে চারটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজিতে ইহাদের নাম Palmarosa or Rusa, Citronella, Lemon-grass and Ginger-grass oils.

জাতির বিভিন্নতা

ইহাদের প্রত্যেকটী হইতেই অতি প্রয়োজনীয় তৈল পাওয়া যায়।

গন্ধবেণার প্রকৃত নাম Cympobogon martini এবং ইহা হইতেই "Rusa oil" (বেণা তৈল) পাওয়া যায়। ইহার অপর জাতি

Cymbopogon nardus হইতে সিট্রোনেলা (citronella) তৈল পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু "রুসা" তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান সমস্ত অংশেই সকল ঋতুতেই প্রচুর গন্ধবেণা জন্মিয়া থাকে। কোথাও কেহ ইহার চাষ করে বলিয়া কোন বিবরণ পাওয়া যায় না; হয়ত প্রজাকে জমা দিবার উদ্দেশ্যে পশুর উৎপাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে পারে মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে গন্ধবেণা বহুদিন ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে উদ্দেশ্যে প্রয়োজন, তাহার পরিচয় খুব পুরাতন নয়। ফরসাইথ (Forsyth) সাহেব ১৮২৭ সালে মধ্যপ্রদেশের নিমার জিলা সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া "বেণা"র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই তৃণে "ফুল আসে" এবং আশ্বিন কার্ত্তিক পর্য্যন্ত তৃণ খুব সতেজ থাকে; মাত্র ঐ সময়েই উহা হইতে তৈল পাওয়া যাইতে পারে। অন্য সময় চেষ্টা করিলে শ্রম ও অর্থের পূর্ণ বিনিময় পাওয়া যায় না। চোলাই দ্বারা তৃণ হইতে এই তৈল স্বতন্ত্র করা হয় এবং সকল প্রদেশেই মোটা-মুটি একই উপায় অবলম্বন করিলেও, সামান্য পার্থক্য প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। চোলাই করিবার সময় জলীয় বাষ্প ও তৈল একই সঙ্গে অপর পাত্রে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জলের উপরে ভাসিতে থাকে। তখন তাহাকে ধীরে ধীরে উপর হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়।

তৈল নিষ্কাসন

এই জাতীয় তৈলের গন্ধের সহিত গোলাপের গন্ধের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জিরানিয়ল (geraniol) নামক সুগন্ধি পদার্থ এই তৈলে বহু পরিমাণে থাকে। সিট্রোনেলা (citronella) তৈলেও জিরানিয়ল আছে এবং এই রাসায়নিক উপাদান উহাদের সুগন্ধের একটী প্রধান কারণ।

উপাদান

সিট্রোনেলা তৈলের মূল গাছ (Cympobogon nardus) ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সিংহল, সিঙ্গাপুর, জাভা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর জন্মে এবং তাহা হইতে তৈলের পরিমাণ অধিক পাওয়াতে, পণ্যের বাজার সেই দিকেই সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের ইহার সহিত কোনই সম্পর্ক নাই।

তৈলের জন্যই গন্ধবেণার এত আদর এবং বর্ত্তমানে প্রায় সওয়া চার লক্ষ টাকার রপ্তানী আছে। প্রধানতঃ ইহা গোলাপের নির্য্যাসের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে; ইহাতে ঐ নির্য্যাস "দানা বাঁধিতে" পারে না; এবং ইহার প্রধান কারণ,—গন্ধবেণা তৈল শীতে জমাট বাঁধে না। ইহার সুগন্ধের জন্য এসেন্স, আতর, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কাজে লাগে এবং এই কারণেই রপ্তানী হয়।

ব্যবহার

আয়ুর্ব্বেদে গন্ধবেণার মূলের ব্যবহার আছে। এই মূল আদার ন্যায় ঝাল ও সুন্দর আস্বাদযুক্ত। ইহা উত্তেজক, বায়ুনাশক, ঘর্ম্মকারক ও আক্ষেপ নিবারক। ত্বকের উপর প্রয়োগ করিলে প্রদাহ উপস্থিত করে।

প্রধানতঃ বোম্বাই বন্দর হইতেই এই তৈল বাহিরে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ ও মূল্য নিম্নের অঙ্ক হইতে পাওয়া যাইবে :—

রপ্তানী—তৈল

	গ্যালন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	১০,৪৩৭	২,৭৯,৭০২
১৯৩৬-৩৭	৮,১২৯	২,৩৬,৯৭৭
১৯৩৭-৩৮	১০,৮৩৭	৪,১৩,৪১৩

১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সালে তৈলের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি না পাইলেও, মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(Lemon Grass Oil)

এই সম্পর্কে আর একটী তৃণ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। ইহার দেশীয় নাম "ধন্বন্তরি" ঘাস এবং পণ্যের তালিকায় ইংরাজিতে Lemon Grass এবং তৈলকে Lemon Grass Oil বলা হয়। পলান্ন সুগন্ধ করিবার জন্য কেহ কেহ এই তৃণ ব্যবহার করেন। বৈজ্ঞানিকেরা Palmarosa বা গন্ধবেণা জাতীয় তৃণের মধ্যে ইহার স্থান দেন।

ইহা হইতে প্রাপ্ত তৈলের পরিমাণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। গত তিন বৎসরের রপ্তানীর হিসাব এইরূপ :—

	গ্যালন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৯৮,৮৭৭	১২,৫৯,৮৯৪
১৯৩৬-৩৭	৮৭,২১৩	৭,১৭,৮৩৮
১৯৩৭-৩৮	৯০,১২১	৭,২২,৮৪৫

যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্স প্রায় অর্দ্ধেক আমদানী করিত এবং অপরাপর ক্রেতার মধ্যে জার্ম্মাণী, ব্রিটেন ও আমরিকার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে আমেরিকাই প্রধান ক্রেতা এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীও অনেক পরিমাণ লইয়া থাকে।

দক্ষিণ ভারতই এই তৈল প্রস্তুত এবং রপ্তানী করিয়া থাকে। করদরাজ্য কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর, মালাবারের দক্ষিণ-অংশ এবং মদ্র প্রদেশের পশ্চিম তীর,—এই সকল স্থানেই প্রায় সমস্ত তৃণ জন্মিয়া থাকে। লোকের সখের বাগানে এই তৃণের ঝাড় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। দেখিতে উলু খড়ের ন্যায় এবং পাতায় বেশ ধার আছে, হঠাৎ পাতার উপর হাত টানিলে হাত কাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এই তৃণ যেমন গোছা বা ঝাড় বাঁধে, উলুতে সেরূপ দেখা যায় না।

পাহাড়ের গায়ে এই গাছ বিশেষ বৃদ্ধি পায়, এবং পৌষ মাঘ মাসে দগ্ধ করিয়া দিলে, পরে গাছগুলি সতেজ হইয়া উঠে। আষাঢ়-শ্রাবণে পাতা সংগ্রহ করা আরম্ভ হয় এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত চোলাই করা চলিতে থাকে। বর্ত্তমানে যে উপায়ে চোলাই করা হয় তাহাতে নানা রকম ভেজাল থাকে, সুতরাং ইহার উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন।

১৮৮৮ সালে বৈজ্ঞানিকে জানিতে পারেন যে এই তৈলে প্রচুর সিট্রল বা সাইট্রল (Citral) আছে। বিশুদ্ধ তৈলে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত সিট্রল পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে অপরিষ্কৃত তৈল চোলাই হয়, তাহাতে শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ মাত্র সিট্রল থাকে। এই উপাদনের জন্যই তৈলের আদর। ইহা সাবান এবং নানারূপ সুগন্ধি এসেন্স প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাতের বেদনায় কোথাও এই তৃণ দ্বারা সেঁক বা স্বেদ দেওয়া হয়।

চেষ্টা করিলে এই তৈলের চাহিদা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে রপ্তানী তৈল সকল রকম ভেজাল বিযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। সচরাচর দুইবার চোলাই করা তৈল দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। আমেরিকা ও ইংলণ্ড এই তৈল আমদানী করে এবং প্রয়োজনমত তৈল পাইলে ইহার চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যবসাক্ষেত্রে অনেকসময় চাহিদা দেখিয়া ভেজাল জিনিষ দিবার অপরাধে আমাদের অনেক পণ্য বাহিরে বিক্রয় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ষ্টার্চ্চ ও গ্লিসারিণ

(Starch & Glycerin)

ষ্টার্চ্চ (Starch)

আমাদের দেশে যতগুলি তণ্ডুল হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আমরা যে সকল দেশ হইতে শ্বেতসার আমদানী করি, তাহারাও এই সকল তণ্ডুল হইতেছে শ্বেতসার বাহির করিয়া লয়। নানাপ্রকার আলু হইতে শ্বেতসার পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে শ্বেতসারের অংশ অত্যন্ত কম বলিয়া লোকে আলু অপেক্ষা তণ্ডুল অধিক ব্যবহার করে। আলু ষ্টার্চ্চের নাম ফারিণা (Farina); ইহাও আমদানী করা হয়। ডেক্সট্রিন (Dextrine or British gum) ও এক প্রকার ষ্টার্চ্চ; শুষ্ক ষ্টার্চ্চ ১৪৯° হইতে ২০৪° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপে ডেক্সট্রিণে পরিণত হয়। ইহা শীতলজলে দ্রবীভূত হইয়া যায়। ডেক্সট্রিণ নামে ষ্টার্চ্চের আমদানী আছে।

সাধারণ তাপে ষ্টার্চ্চ জলে দ্রব হয় না; এমন কি সুরাসার বা ইথারেরও ইহার উপর কোনও ক্রিয়া নাই। বায়ু হইতে ইহার আর্দ্রতা শোষণ করিবার শক্তি অসাধারণ। বায়ুতে শুষ্ক করিলেও ইহাতে শতকরা ১৬ হইতে ২৮ ভাগ পর্য্যন্ত জল থাকে এবং বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যে (vacuum pots) শুষ্ক করিলেও শতকরা ১০ ভাগ জল থাকিয়া যায়।

ইহার বহুতর ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে “ধান্য” অধ্যায়ে সমস্তই বলা হইয়াছে (পাতা ৯, ১০)। কিন্তু আমাদের দেশে একটীও ষ্টার্চ্চের

কারখানা নাই। আমরা প্রতি বৎসর প্রায় ষাট লক্ষ টাকার ষ্টার্চ্চ আমদানী করি, এবং ইহার আমদানী প্রতিবৎসরই বাড়িয়া চলিতেছে। আম্বালাসহরে একটী কারখানা স্থাপিত হইতেছে; আশা করা যায় আমরা ক্রমশঃ দেশী ষ্টার্চ্চ ব্যবহার করিতে পাইব।

ষ্টার্চ্চের আমদানী :—

	হন্দর	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৬,৫৭,৭৩৪	৪১,১২,৬০৬
১৯৩৬-৩৭	৬,৮০,২১১	৪৪,১৯,২৬২
১৯৩৭-৩৮	৮,৪১,৭৬২	৫৯,৪৪,১৭৮

আমাদের দেশে ষ্টার্চ্চ বিক্রেতাদিগের মধ্যে ষ্ট্রেট্‌স সেট্‌লমেণ্টস্, নেদারলণ্ড, জার্ম্মাণী ও আমেরিকা নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলজিয়ম, জাপান, জাভা, ফ্রান্স প্রভৃতি নানা দেশও কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া থাকে।

১৯৩৭-৩৮ সালে ৫৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার ষ্টার্চ্চ এদেশে আমদানী হয়; নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বিক্রেতাদিগের প্রত্যেকের অংশ বুঝিতে পারা যাইবে :—

১৯৩৭-৩৮

	টাকা	শতকরা অংশ
ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেণ্টস্	২০,৩১,৯২৭	৩৪·১
জার্ম্মাণী	১৩,২৬,৫৯৮	২২·৩
নেদারলণ্ড	১২,৮৬,৪১৬	২১·৬
আমেরিকা	৫,৮১,৫৫৬	৯·৭

বেলজিয়ম, জাপান, জাভা, ফ্রান্স ইত্যাদি কিছু কিছু দিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কল বেশী থাকায়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

আমদানী (৬৪·৮%) বোম্বাই বন্দরে হইয়া থাকে। তাহার পর বাঙ্গলা (২৯·২ %) ও মদ্রের (৫·১ %) স্থান পড়ে।

গ্লিসারিণ (Glycerin)

পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে তৈলবীজ ও তৈল সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটী প্রয়োজনীয় বস্তুর আমদানী আছে, কিন্তু এদেশে কোনও কারখানা নাই। সাধারণতঃ ষ্টার্চ্চ বা স্নেহজাতীয় পদার্থ হইতে গ্লিসারিণ প্রস্তুত হয়। এই কার্য্য নানা উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ইহা আরও স্বল্পমূল্য এবং সহজপ্রাপ্য হইয়া আসিবে।

চর্ব্বি বা স্নেহ, যখন সাবান, বাতির উপাদান বা বসাম্ল (fatty acids) রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে তখন গ্লিসারিণ বিযুক্ত হইয়া পড়ে ("Glycerin is liberated during the conversion of fats to soaps, candle material or fatty acids"). সচরাচর সাবান প্রস্তুত করিবার সময় ক্ষার ও চর্ব্বি বা স্নেহ মিশ্রিত যে জল (lye) সাবান তৈয়ারী করিবার পাত্রে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্লিসারিণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল প্রক্রিয়ায় বসা বা স্নেহপদার্থ হইতে উহার মূল উপাদান গুলি, অর্থাৎ বসাম্ল (fatty acids) এবং সুরাসার পাওয়া যাইতে পারে, এতৎ সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া হইতেই গ্লিসারিণ পাওয়া সম্ভব। এমন কি জলের সহিত কিছু ধাতব পদার্থ, যথা ম্যাগ্নেসিয়ম বা zinc oxide মিশ্রিত করিয়া কোনও বিশেষ আধারের (autoclave process) মধ্যে ১২০° হইতে ১২৫° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপ দ্বারা চর্ব্বিকে বিভি

উপাদানে ভাগ করিয়া ফেলা যাইতে পারে। বসা মাত্রেই গ্লিসারল থাকায় উপরোক্ত নানা উপায়েই গ্লিসারিণ পাওয়া যায়।

গ্লিসারিণ বর্ণ ও গন্ধহীন, স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ মিষ্টাস্বাদযুক্ত তৈলবৎ পদার্থ এবং ইহাতে কিঞ্চিৎ জলীয় ভাগ থাকে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরক এবং তৎসংক্রান্ত নানারূপ গুলিবারুদ করিতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। নাইট্রো-গ্লিসারিণ (Nitro-glycerin) ও নাইট্রো-সেলুলোস্ (Nitro-cellulose) লাগে গোলাগুলির প্রচণ্ডতা ও বেগ বৃদ্ধি করিবার জন্য; এবং গ্লিসারিণ তাহার উপাদান।

আকৃতি-ধারণক্ষম কর্দ্দমকোমল পদার্থ (plastic clays) প্রস্তুত করিতে, তাপহীন স্থানে জমাট না বাঁধে এমন মশলা (anti-freeze composition) প্রস্তুত করিতে, ঘর্ষণ রোধের জন্য যেখানে তৈল ব্যবহার করা প্রয়োজন, অথচ কোনও বিশেষ কারণে সম্ভব নয়, —সেরূপ স্থলে ব্যবহার করিতে গ্লিসারিণ প্রয়োজন। টীকার বীজ রক্ষা করিবার জন্য রস (vaccine lymphs) হিসাবে, বাষ্প-মান (gas meters) যন্ত্র পূর্ণ করিতে, তামাক, নস্য এবং স্পিরিটের ব্যবসায়ে গ্লিসারিণ প্রচুর লাগে।

গায়ে মাখা সাবান, কালি, ছাপার কালি, মুদ্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং কাগজপত্র (rollers, duplicating rolls and papers) এবং বর্ষাতি বা ওয়াটারপ্রুফ করিতে ইহার প্রয়োজন।

নানারূপ রোগে গ্লিসারিণের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। ইহা স্নিগ্ধ এবং আর্দ্রকারক; সরলান্ত্রে পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করিলে মলত্যাগের সহায়ক হয়। কর্ণের শুষ্কতাজনিত বধিরতা রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা উৎকৃষ্ট পচননিবারক।

আমদানীর অঙ্ক খুব বেশী না হইলেও ইহার ব্যবহারের তালিকা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং আমাদের দেশে ইহার কারখানা প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। আমদানীর অঙ্ক :—

	হন্দর	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৯,৮৩৮	৪,২৭,৭৪৫
১৯৩৬-৩৭	১,৯৫৬	৭০,৩৭৬
১৯৩৭-৩৮	১,৬১৩	১,০৭,০১৫

যদি গ্লিসারিণ এদেশে তৈয়ারী হয়, তাহাতে এখানে নানারূপ শিল্পের প্রসার স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে।

পরিশিষ্ট

(১৯৩৭-৩৮)

পৃথিবী এবং কয়েকটী প্রধান প্রধান দেশের মোট ফলন

কার্পাস বীজ—(হাজার টন)—মোট ১,৬৮,৩০ ; আমেরিকা ৭৬,২৩ ; ভারতবর্ষ ২৩,৭০ ; চীন ১৬,১৪ ; ব্রেজিল ১১,০৩ ; প্রভৃতি।

গম—(হাজার টন)—মোট ১৩,৩১,৫৫ ; রুশ গণতন্ত্র ৩,০৫,০০ ; আমেরিকা ২,৩৫,৪৯ ; চীন ১,৭১,৪৭ ; ভারতবর্ষ ৯৮,৭২ ; প্রভৃতি।

চীনাবাদাম—(হাজার টন)—মোট ৬৫,৩৪ ; ভারতবর্ষ ৩২,৭৮ ; চীন ২৬,০৪ ; নাইজিরিয়া ৪,৬৯ ; ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জ ২,৩৬ ; ব্রহ্ম ২,০১ ; প্রভৃতি।

জই—(হাজার টন)—মোট ৬,৫০,৮৩ ; রুশ গণতন্ত্র ১,৮১,৮৭ ; আমেরিকা ১,৬৪,৭১ , জার্ম্মানী ৫৮,৫৯ ; প্রভৃতি।

তিল—(হাজার টন)—মোট ১৬,৮৩ ; চীন ৮,৬১ ; ভারতবর্ষ ৪,৭৪ ; ব্রহ্ম ৫২ ; প্রভৃতি।

তিসি—(হাজার টন)—মোট ৩৩,২৬ ; আর্জ্জণ্টাইন ১৫,২৪ ; রুশ গণতন্ত্র ৭,৯০ ; ভারতবর্ষ ৪,২০ ; আমেরিকা ১,৭৫ ; উরুগায় ১,০৪ ; প্রভৃতি।

ধান—(হাজার টন)—মোট ১৩,৯৯,৮৬ ; ভারতবর্ষ ৩,৯৮,১৬ ; চীন ৩,৯৬,০০ (?) ; জাপান ১,২১,৮৬ ; ব্রহ্ম ৬৮,৬৮ ; ইন্দো-চীন ৬২,৩৭ ; ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জ ৫৭,৪২ ; শ্যাম ৪৬,৪৮ ; প্রভৃতি।

নারিকেল—(হাজার টন)—রপ্তানীর মোট পরিমাণ ১৬,৪৩ ; ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জ ৫,২৮ ; ফিলিপাইন ৪,৯০ ; সিংহল ১,৭৮ ; ব্রিটিশ মালয় ১,৩৯ ; প্রভৃতি।

ভুট্টা—(হাজার টন)—মোট ১১,৬৬,২২ ; আমেরিকা ৬,৬৫,১৩ ; আর্জ্জেণ্টাইন ৪৪,৫৫ ; চীন ৬১,৩৮ ; প্রভৃতি।

যব—(হাজার টন)—মোট ৪,০১,৯৪ ; রুশ গণতন্ত্র ৮১,১৮ ; চীন ৬৩,০৭ ; আমেরিকা ৪৭,৩৪ ; জার্ম্মাণী ৩৬,০১ ; ভারতবর্ষ ২৩,২১ ; প্রভৃতি।

শব্দ-নির্ঘণ্ট

Alphabetical Index

ভ্রম সংশোধন

৩২ পৃষ্ঠায় "মধ্যপ্রদেশ ও বিহার" স্থলে "মধ্যপ্রদেশ ও বিরার" হইবে। ৯৪ পৃষ্ঠায় "চীনাবাদামের চাষ" পরিশিষ্টে (ঘ) ভারতবর্ষ "৬৫,৫০" (হাজার) টন স্থলে "২৬,৬৬" (হাজার) টন এবং চীন "২৭,১৮" (হাজার) টন স্থলে "২৬,০৫" (হাজার) টন হইবে। ৯৬ পৃষ্ঠায় (চ) পরিশিষ্টে ক্রেতার "সংশ" স্থানে "অংশ" হইবে। ১৭৭ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের শিরোনামায় "মোরি" স্থানে "মৌরি" হইবে।